ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

৮৩ রবীন্দ্রাব্দ

এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ, গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ, জগৎ-কবি-সভার মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথ—আমাদেরই। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর মূর্ত্তি সুন্দর, তাঁর বাক্য সুন্দর, তাঁর কাব্য সুন্দর—তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁর জীবন-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাগুলিই কেবল মনে আসে—

"এই লভিনু সঙ্গ তব,
  সুন্দর, হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম,
  ধন্য হ'ল অন্তর,
  সুন্দর, হে সুন্দর॥
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল
  সৌরভেতে মন্থর,
  সুন্দর, হে সুন্দর॥"

০ ০ ০

এই অনন্যসুন্দরের অন্তরতম প্রতিকৃতিটির স্নিগ্ধজ্যোতি আমাদের ছেলেমেয়েদের সরল শুভ্র চিত্তে প্রতিফলিত হ'য়ে তাদের নবীন প্রাণগুলিকে বিকশিত করুক, উন্নত করুক, ধন্য করুক—এই কামনা।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

"ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ" সব প্রথম বেরিয়েছিল প্রায় আঠারো বছর আগে। কবি তখন জীবিত। কবির জীবন-কালে এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় এবং তাঁর আশীর্বাণীও লাভ করে। কবির মহাপ্রয়াণের পর যথারীতি এব পরিবর্ত্তিত তৃতীয় সংস্করণ হয়। এখন পরিবর্দ্ধিত আকারে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

কাগজ, মুদ্রণ ইত্যাদির ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার দামও কিছু বাড়াতে হ'ল। তবে এই দুর্ম্মূল্যের বাজারেও বইটিকে পরিপাটি ক'রে বার ক'রতে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। বইখানি এবার ছেলেমেয়েদের আরো বেশী আনন্দদান করবে আশা করি।

প্রকাশক

সূচি

চিত্র-সূচি

ছবিগুলি শ্রদ্ধাভাজন প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এ জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।
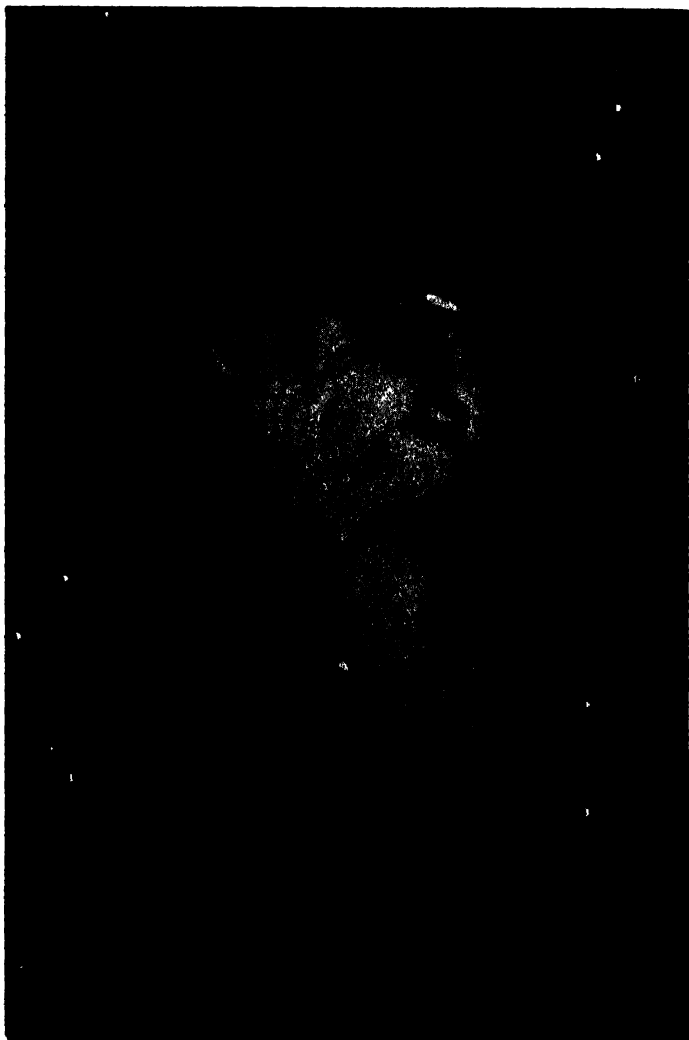
রবীন্দ্রনাথ
একাশীতিতম জন্মতিথির রাত্রে

ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ

তোমরা সবাই কবিতা খুব ভালবাস নিশ্চয়। তার উপর সে কবিতা যদি তোমাদের মনের মতো হয়, তা হ'লে তো আর কথাই নেই। তোমাদের ভিতর এমন কি কেউ আছ, যে মেঘের উপর মেঘ জমেছে দেখে, ভাই-বোনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচতে-নাচতে বলো না!—

"দিনের আলো নিবে এল, সূর্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
... ...
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্‌লা দিনের গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর্ নদী এল বান।"

বাঁশী, ফুটবল, বন্দুক, এ-সব তোমাদের কতই না প্রিয়! কিন্তু মেঘ্‌লা দিনের ঐ গানটি, এই সবের চেয়ে কি কোন

অংশে কম ! রবিবারের ছুটিতে তোমাদের কতই না আমোদ ! কবে রবিবার আসবে এই আশায় সোমবার থেকেই তোমরা দিন গুণতে আরম্ভ কর,—

“সোম মঙ্গল বুধ এরা সব আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত হাওয়া-গাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মাগো, এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌঁছয় সে সকল বারের পরে।

... ...

সোম মঙ্গল বুধের যেন মুখগুলো সব হাঁড়ি,
ছোট ছেলের সঙ্গে তাদের বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে যেম্‌নি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি হাসিই আছে লেগে।”

... ...

পড়া ব’লতে না পারার দরুণ মাষ্টার মশায়ের কাছে বকুনি খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে এসে মাকে যখন বলো,—

“সাত-আট্‌টে সাতাশ,’ আমি বলেছিলেম বলে
গুরুমশায় আমার পরে উঠল রাগে জ্বলে।
মাগো, তুমি পাঁচ পয়সায় এবার রথের দিনে
সেই যে রঙিন পুতুলখানি আপনি দিলে কিনে,
খাতার নীচে ছিল ঢাকা ; দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগে মেগে ভেঙে দিলেন ফেলে।”

তোমার ছোট ভাইটি যখন পড়া ক'রতে ক'রতে ছুটে পালিয়ে এসে মায়ের কাছে বায়না ধরে,—

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা!
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা!
তুমি বল্‌ছ দুপুর এখন সবে,
না হয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিনো কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই?"

আর শেষটায় তুমি নিজে যখন লেখা, পড়া, অঙ্ক-কষা—এগুলোর একটাকেও কাবু ক'রতে না পেরে ভারি বেজার হ'য়ে মাকে গিয়ে বলো,—

"নাই যদি হই ভালো ছেলে, কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই গুটি পোকার গুটি,
মুর্খু হয়ে রইব তবে? আমার তাতে কিই-বা হবে,
মুর্খু যারা তাদেরি ত সমস্তখন ছুটি।"

আর এই সব-তাতেই সায় দিয়ে মা তোমায় কোলে তুলে নিয়ে আদর ক'রে যখন বলেন,—

"বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল?
কে তোরে যে কি বলেছে
আমায় খুলে বল্‌!"

তখন তোমাদের কতই না আহ্লাদ হয়! তখন তোমাদের আর কোন ভয় থাকে, না ভাবনা থাকে!

আচ্ছা, এই কবিতাগুলি তোমাদের খুবই ভাল লাগ্‌ছে নিশ্চয়। কেননা, এতে তোমাদেরই যে মনের কথা র'য়েছে! তোমরা হয়তো ভাবছো, এগুলি যাঁর লেখা, তিনি তোমাদেরই একজন। হয়তো বা তিনি তোমাদের মতোই ছেলেমানুষ! এই সব কবিতা যাঁর লেখা, বয়স তাঁর যত হোক্ না কেন, তিনি ছিলেন তোমাদেরই একজন। ইনি কে, তা তোমরা এবার বুঝতে পেরেছ কি? তোমাদের ভিতর যারা বড়, এই কবিতাগুলি থেকেই এঁকে চিনেছে নিশ্চয়। অনেকে হয়তো এঁকে দেখেওছ। নামেতেই এঁর পরিচয়—ইনি আমাদের **রবীন্দ্রনাথ**।

রবীন্দ্রনাথ একজন কবি। কিন্তু শুধু কবি ব'ললে কিছুই বলা হয় না। যদি বলি যে, পৃথিবীতে যত কবি আছেন, তাঁদের তিনি রাজা, তা হ'লেও তাঁকে খুব বড় বলা হ'ল না। তিনি শুধুই কবি নন, তিনি দার্শনিক ও মানব প্রেমিক। তিনি তাঁর কবিতা, গান ও রচনার ভিতর দিয়ে বিশ্ব মানবের মৈত্রীর কথা এমন সুন্দর ক'রে ব'লে গেছেন, যা পৃথিবীর আর কোন কবি পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, চীন, জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে গেছলেন, তখন সে-সব দেশ থেকে যে ভক্তির অর্ঘ্য তিনি পেয়েছিলেন, কোন কবির জীবনে তেমন আর কখনো হয় নি। ঐ সব মহাদেশের বড় লোকেরা, পণ্ডিতেরা আর গুণী

লোকেরা তাঁকে এ-রকম সম্মান দেখিয়েছিলেন যে, সে রকম সম্মান সে-সব দেশের সম্রাটরা পর্য্যন্ত কখনো পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে, গান আর কবিতার ভিতর দিয়ে এমন সব উঁচু ভাবের কথা ব'লেছেন যে, তা কেবল তোমার-আমার কথা নয়—তাকে এই সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানব-জাতির মনের কথা, প্রাণের কথা বলা যেতে পারে; আর তা এমনই এক মিলনের সুরে বাঁধা যে, তা সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জাতির ঝগড়া-বিবাদ, ভেদাভেদ, দ্বেষ-হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি মিটিয়ে দিয়ে সকল মানুষকে দেবতা ক'রে তুলতে পারে।

তোমরা এখন থেকে তাঁর লেখা প'ড়ো, প'ড়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রো, বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে নিও; দেখবে তা কত সুন্দর! যতই তোমাদের জ্ঞান বাড়বে, তাঁর লেখা প'ড়ে ততই তোমরা মুগ্ধ হবে। দেখবে, তিনি শুধু কবি নন,—তিনি তপস্বী, তিনি ত্যাগী আর সর্ব্বোপরি তিনি একজন ঋষি। রবীন্দ্রনাথের ছবিটি একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি। এমন শান্ত, সৌম্য, উজ্জ্বল মূর্ত্তি আর কোথাও দেখেছ কি? দেখলেই ঋষি ব'লে কি মনে হয় না? এই ঋষি রবীন্দ্রনাথের কথাই আজ তোমাদের শোনাব।

মনের খেলা

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর বাল্যজীবন বড়ই বিচিত্র। তিনি যখন ছেলেমানুষ, যখন তিনি তোমাদের মতোই শিশু, তখনই তিনি এই পৃথিবীকে এমন এক চোখে দেখতেন, যা তোমরা-আমরা সচরাচর দেখি না। এই বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত জিনিস,—যেমন গাছপালা, পাখীর গান, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-তারা, মেঘ-বৃষ্টি, ফল-ফুল, এমন কি রাস্তার লোকজন—যা তিনি দেখতেন, তার ভিতর পর্য্যন্ত দেখতে পেতেন। এই সমস্ত জিনিস জীবন্ত হ'য়ে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌তো—বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষ যেন তাঁর সঙ্গে কথা ব'লতো। কি রকম ক'রে,—তা তাঁরই লেখা দু-একটি কবিতায় তোমাদের শোনাই—

"মেঘের মধ্যে মাগো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে!
বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা,
সকাল থেকে দুপুর সন্ধ্যেবেলা।
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রূপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধরে!"
আমি বলি 'যাব কেমন করে'?
তারা বলে 'এস মাঠের শেষে!
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে'!"

... ...

"ঐ যে রাতের তারা জানিস কি, মা, কারা ?
সারাটিখন ঘুম না জানে চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন ধারা !
আমার যেমন নেইক ডানা, আকাশপানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেমনি ওদের পা নেই বলে পারে না যে আস্‌তে চলে
এই পৃথিবীর পরে।

... ...

রবীন্দ্রনাথ খুব বড় ঘরের ছেলে। তাঁর বাপ-পিতামহ মস্ত ধনী। যে-বংশে তিনি জন্মেছিলেন, তা ধনে, মানে, বিদ্যায়, পদ-গৌরবে সব রকমেই বড়। কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় এঁদের বাড়ী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর মতো বিখ্যাত বংশ শুধু কলিকাতায় বা বাংলাদেশে কেন, আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এ বংশের সবাই গুণী। অনেক বিখ্যাত লোক ঐই বংশে জন্মেছেন। এক কথায় ব'লতে গেলে এই বংশটি লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মিলন স্থান।

বড় ঘরের ছেলে হ'লেও ছোট বেলায় রবীন্দ্রনাথকে খুব সাদাসিদে ভাবে থাকতে হ'ত। বাবুগিরির নাম-গন্ধও তখন ছিল না। নিজেই তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন—"আহারে আমাদের সৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা

ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্ব্বে কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা শাদা জামার উপরে আর একটা শাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।…আমাদের চটি জুতা এক জোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম।”

তাঁদের বাড়ীর নিয়ম-কানুনও ছিল ভারি কড়া। বাড়ীর বাইরে যাওয়া একেবারেই বারণ। বেশীর ভাগ সময় তাঁকে চাকরদের শাসনেই থাকতে হ'ত। সে বড় কড়া শাসন। তাঁদের এক ছোকরা চাকর ছিল—তার নাম শ্যাম। সে ভারি মজা ক'রতো। সে ক'রতো কি, রবীন্দ্রনাথকে একটি ঘরের ভিতর বসিয়ে খড়ি দিয়ে তাঁর চারিদিকে গণ্ডি কেটে দিতো, আর খুব গম্ভীর মুখ ক'রে ব'লে যেতো খবরদার, এই গণ্ডি পার হয়েছ কি বিপদে পড়েছ। রবীন্দ্রনাথ বিপদের ভয়ে গণ্ডির বাইরে যেতে সাহস ক'রতেন না। তিনি ঘরের ভিতর চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের জিনিষ তন্ময় হ'য়ে দেখতেন। এ সব রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা—নিজেই তিনি এ সব ব'লেছেন।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। পুকুর-পাড়ে একধারে ছিল প্রকাণ্ড একটা বটগাছ আর এক সারি নারিকেল গাছ। তিনি জানালার খড়খড়ি খুলে সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বইয়ের মতো দেখে দেখে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়ে

দিতেন। কত লোক আসতো, স্নান করতে। কত রকম ভঙ্গীতে তারা ডুব পাড়তো, তা তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখতেন। তারপর দুপুর বেলা পুকুর-ঘাট জন-শূন্য হ'য়ে গেলে পর, সেই প্রকাণ্ড বটগাছের তলাটা তাঁর সমস্ত মনখানিকে দখল ক'রে নিতো। বটগাছটার গুঁড়ির চারধারে বিস্তর ঝুরি নেমে সে জায়গাটা অন্ধকার ক'রে রেখেছিল। তাঁর চোখে সেই বট-তলার অন্ধকার জায়গাটা তখন ভারি রহস্যময় ঠেক্‌তো। বড় হ'য়ে তিনি এই বটকেই উদ্দেশ ক'রে লিখেছিলেন—

"নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?
... ...
মনে কি নেই সারাটি দিন বসিয়ে বাতায়নে,
তোমার পানে রইত চেয়ে অবাক্ দু-নয়নে ?
তোমার তলে মধুর ছায়া তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচ্‌ত বসে শালিখ পাখী দুটি।
ভাঙা ঘাটে নাইত কারা তুল্‌ত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার করত টলমল।
জলের উপর রোদ পড়েছে সোনামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোট ছেলে রইত চেয়ে বাসনা অগাধ,
মনের মধ্যে খেলাত তার কত খেলার সাধ।"

শুধু যে বাড়ীর বাইরে যাওয়াই তাঁর বারণ ছিল তা নয়, বাড়ীর ভিতরেও সব জায়গায় যেমন-খুসি তাঁর যাওয়া চলতো না। কিন্তু এই রকম বাঁধা-ধরার মধ্যে থেকেও তাঁর মনের মধ্যে আনন্দের এতটুকুও অভাব ছিল না। তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে ফাঁক-ফুকর দিয়ে উকিঝুঁকি মেরে দেখতেন, আর তাইতে তাঁর শিশু-মন উল্লাসে ভ'রে উঠতো। বাড়ীর ভিতরে একটি বাগান ছিল, সেটি যে খুব বড়, তা নয়। সেখানে খুব বেশী গাছপালা ছিল না। একটা বাতাবি নেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া আর এক সার নারিকেল গাছ নিয়ে ছিল এই বাগানটি। কিন্তু এই বাগানটিই ছিল তাঁর স্বর্গের বাগান। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গলেই তিনি এই বাগানে এসে হাজির হ'তেন। একটি শিশির মাখা ঘাসপাতার গন্ধ ছুটে আসতো, আর পূব দিকের পাঁচীরের উপর নারিকেল পাতার ঝালরগুলির ভিতর দিয়ে সোনালি রোদ মুখ বাড়াতে থাকতো।

কত রকম বেরকমের কল্পনা যে উঠতো তাঁর মনে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। তাঁর ঠাকুর-মাদের আমলের পুরাতন একটা পালকি পড়েছিল খাতাঞ্চিখানার বারান্দার এক কোণে। এই পালকিখানাকে ঘিরেই কত কথা তাঁর মনে হ'ত। সে সব ভারী চমৎকার। তার কিছু কিছু তাঁর নিজের কথাতেই শোন,—

"...আমার বয়স তখন সাত আট বছর। এ সংসারে কোন দরকারী কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পালকিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে

দেওয়া হয়েছে। এই জন্যেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন্‌ক্রুসো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চারিদিকের নজরবন্দী এড়িয়ে বসে আছি।···একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরী বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে সব দেশের বইপড়া নাম আমারি লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, গা করছে ছম্ ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম, ব্যাস্ সব চুপ। তারপরে একসময়ে পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্, ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল সামাল, ঝড় উঠল। হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ,—আর কচ্ছপের ডিম।··· এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার শফর, পালকির বাইরে এক একদিন ছিল আমার মাস্টারি, রেলিংগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক একটা ছিল ভারি দুষ্ট, পড়াশুনোয় কিচ্ছুই মন নেই, ভয় দেখাই যে বড়ো হোলে কুলিগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া

গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না, কেননা থামলে যে চলে না খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরো একটা খেলা ছিল সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নৈলে পূজা হয় না।

"সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট্ ঢুলুকুট ঢ্যাম্‌কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খটখট খটাস্
পটপট পটাস।"

এই রকমের আরো আরো কত কি তাঁর মনে আসতো।

আবার কোন কোন দিন দুপুরবেলা চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হ'য়ে গেলে পর বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কত রকমই তিনি ভাবতেন! মাথার উপরে নীল আকাশ, রোদ একেবারে চক্‌চক্ ক'রছে—আকাশের কোণ থেকে মাঝে মাঝে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক তাঁর কানে এসে পৌঁছত। রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা "চাই, চুড়ী চাই, খেলোনা চাই" ব'লে হেঁকে যেতো। মাথার উপরের নীল আকাশ, চক্‌চকে রোদ, নারিকেল গাছের সারি, মাটি, জল, দূরের ঘর-বাড়ী, এই সব জড়িয়ে তাঁর সমস্ত মনটাকে একেবারে উদাস ক'রে দিতো। তাঁর মনটি তখন বোধহয় এই কথাই ব'লতো—

"আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ঐ পারে,—

যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে ;
জাল টেনে নেয় জেলে ;
গরু মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।”

... ...

“আমি যাব রাজপুত্র হয়ে
নৌকো ভরা সোনামাণিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা তিনজনে !
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার !”

“দাদার জন্যে আনব মেঘে-ওড়া
পক্ষীরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।
বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনকলতার চারা অনেকগুলি ;—
তোর তরে মা দেব কৌটা খুলি
সাত রাজার ধন মাণিক একটি জোড়া !”

ছোট বেলাতেই রবীন্দ্রনাথের মন কি বিচিত্র কল্পনার ভিতর দিয়েই ঘুরে বেড়াতো !

বংশ-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বাপ-পিতামহ খুব ধনী ছিলেন, এ কথা আগেই ব'লেছি। কিন্তু তাঁরা যে কত মহৎ ছিলেন, সে কথা বলা হয় নি। এবার তা ব'লবো।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। ১৭৯৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। দ্বারকানাথের জীবনের ইতিহাস ঠিক উপন্যাসের মতো। তাঁর সমান ধনী তখনকার দিনে বাংলাদেশে আর একজনও ছিলেন কি না সন্দেহ। নিজের চেষ্টায় তিনি ক্রোড় ক্রোড় টাকা উপার্জ্জন ক'রেছিলেন। তাঁর উপার্জ্জন-শক্তি যেমন অদ্ভুত, দানশক্তিও তেমনি অদ্ভুত ছিল। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলি—

একবার এক জজ সাহেব ছুটি নিয়ে বিলাত যাচ্ছিলেন। যাবার সবই ঠিক, এমন সময় তাঁর পাওনাদারেরা তাঁকে খবর দিল যে, তাঁর লাখ টাকার উপর ধার। সে ধার শোধ না দিলে জজ সাহেবকে জেলে যেতে হবে। তিনি তখন মহাবিপদে প'ড়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখে সব কথা জানালেন, আর টাকার সাহায্য চাইলেন। দ্বারকানাথ জজ সাহেবের পাওনাদারদের ডাকিয়ে সমস্ত ধার শোধ ক'রে দিলেন, আর তাদের কাছ থেকে খতের কাগজপত্রগুলি চেয়ে নিলেন। তারপর নিজে চ'ললেন জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে। জজ সাহেব

আর একজনও ছিল না, এ কথা বললে বেশী কিছুই বলা হ'ল না। তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবে দেশবাসী মুগ্ধ হ'য়েছিল আর তিনি মহর্ষি আখ্যায় ভূষিত হ'য়েছিলেন। তাঁর চরিত-কথা শুনলে বহু পুণ্য লাভ হয়। ফুলের সুবাস নাকে এলে মন যেমন প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে, মহর্ষির কথা শুনলেও মন তেমনি আপনা আপনি ভক্তি ও আনন্দে ভ'রে ওঠে। তাঁর অপূর্ব্ব চরিত-কথা অল্পের ভিতর বলা অসম্ভব। বড় হ'য়ে তোমরা তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে জেনো। তিনি যে কত মহৎ, কত উদার ছিলেন, কেবল সেই সম্বন্ধে দু-এক কথা তোমাদের শোনাব।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন মারা গেলেন তখন তাঁর বিস্তর টাকা দেনা। বিলাতে তিনি রাজার ঠাটে থাকতেন, তা ছাড়া, তাঁর দান ছিল অসাধারণ রকমের। এই সব কারণে তাঁর প্রায় এক ক্রোড় টাকা দেনা হয়। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩০ বৎসর। হিসাবপত্র ক'রে দেখা গেল, পাওনা সত্তর লক্ষ টাকা, দেনা কিন্তু এক কোটি টাকা। পিতার এই দেনা কি করে তিনি শোধ দেবেন, ভেবে আকুল হ'লেন। তিনি সকল পাওনাদারকে ডেকে পাঠালেন আর সমস্ত ব্যাপার খুলে ব'ললেন। দেবেন্দ্রনাথের নিজের জন্যে কিছু সম্পত্তি তাঁর পিতা রেখে গেছলেন। এ সম্পত্তিতে পাওনাদারদের হাত দেবার কোনই অধিকার ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ জানতেন, দেনার জন্যে তাঁর এই সম্পত্তির কোনই ক্ষতি হবে না.আর এই সম্পত্তি

থাকলে তাঁর কিছুরই অভাব থাকবে না। কিন্তু নিজে তিনি সম্পত্তি ভোগ ক'রতে থাকবেন, আর পাওনাদারেরা তাদের ন্যায্য টাকা পাবে না, এ কি হ'তে পারে? তিনি অন্য-সব বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে নিজের এই সম্পত্তিটিও পাওনাদারদের হাতে ছেড়ে দিতে চাইলেন। পাওনাদারেরা তো এই দেখে অবাক্। অনায়াসে তিনি এই সম্পত্তি বাঁচাতে পারেন, কিন্তু তা না ক'রে যথা-সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছা ক'রে ফকির হ'তে বসেছেন। তাঁর আত্মীয়েরা কত ক'রে তাঁকে বোঝালেন, এ সম্পত্তিটিও ছেড়ে দিলে একেবারেই যে তিনি পথে বসবেন! কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কি ব'ললেন, শুনবে? তিনি ব'ললেন, "যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ বলিতে পারিব না যে সব দিলাম। এমনই সকলই দিব। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তিনি সব দিলেন। তাঁর হাতে একটি দামী আংটি ছিল। তিনি ব'ললেন, "এই আংটিটা আমার আছে; আমার বিষয়-সম্পত্তির তালিকার মধ্যে এটাকেও ধরা উচিত।" পাওনাদারেরা তাঁর অসাধারণ সরলতা দেখে মুগ্ধ হ'লেন। অনেকের চোখে জল এলো। আজ এঁরা রাজপুত্র, কাল কিন্তু হবেন পথের কাঙাল। তাঁরা বুঝলেন, এঁরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। শেষে দেনা-পাওনার একটা মীমাংসা হ'ল। পাওনাদারেরা সমস্ত বিষয় দেবেন্দ্রনাথের হাতেই রাখলেন। ঠিক হ'ল, দেবেন্দ্রনাথ নিজেই সব দেখবেন আর ক্রমশঃ দেনা শোধ করবেন। বিপদ এই ভাবে কেটে গেল—সাধুতারই জয় হ'ল।

দেবেন্দ্রনাথ ধনী ছিলেন—বিষয়ী ছিলেন, কিন্তু বিষয়ের দাস ছিলেন না। তাঁর দিদিমার মৃত্যুর পর একদিন বৈঠকখানায় ব'সে তিনি সকলকে ব'লেছিলেন, "আজ আমি কল্পতরু হইলাম, আমার কাছে যে যাহা চাহিবে তাহাকে আমি তাহাই দিব।" এই ব'লে বড় বড় আয়না, সুন্দর সুন্দর ছবি, জরির পোষাক, দামী আসবাবপত্র যা তাঁর ছিল সব বিলিয়ে দিলেন।

একদিন একজন লোক এসে দেবেন্দ্রনাথকে ব'ললেন, "মহাশয়, আপনার পিতা আমাদের দাতব্য সমিতিতে এক লক্ষ টাকা দান করবেন ব'লে কথা দিয়েছিলেন। তিনি সে টাকা দিয়ে যেতে পারেন নি। আপনি এখন আমাদের সেই টাকা দিন।" দেবেন্দ্রনাথ তখন কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। পাওনাদারদের দেনা তখন মাথার উপর। এত টাকা দেওয়ার অবস্থা তাঁর তখন নয়। এই টাকা তিনি নাও দিতে পারতেন। না দিলে কেউ তাঁকে অপরাধী ক'রতো না। কিন্তু তাঁর পিতা একবার যখন কথা দিয়ে গেছেন, তখন তিনি একে পিতৃ-ঋণ ব'লেই ধ'রে নিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক লক্ষ টাকা সুদ সমেত সেই দাতব্য সমিতিতে দিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ দান ক'রতেন, কিন্তু নামের জন্যে নয়। যে লোককে যা দিতেন, আগে তা ঈশ্বরকে নিবেদন ক'রে পরে তা নৈবেদ্যের মতো সেই লোককে দিতেন। কোন লোককে তিনি ফেরাতেন না। সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি অনেক টাকা দান

ক'রে যান। নানারকমের ধার শোধ করা ছাড়া তিনি প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা সমস্ত জীবনে দান ক'রেছিলেন।

নিজের দেশকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর অন্তরে দেশী ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁর কোন এক অতি প্রিয় জন একবার ইংরাজীতে তাঁকে একখানি চিঠি লেখেন। চিঠি খুলে যেমন দেখলেন যে সেটি ইংরাজীতে লেখা, অমনি না পড়েই সে চিঠিখানি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। মাতৃভাষার উপর তাঁর এমনই ছিল অসাধারণ শ্রদ্ধা।

সংসারে থাকতে হ'লে মানুষকে যা যা ক'রতে হয়, তার সবই তিনি ক'রতেন, কিন্তু তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের আরাধনা। তিনি ব'লতেন—পরে যাতে সুখী হবে, এখন তা কর, কিন্তু অনন্তকাল ধ'রে যাতে সুখী হ'তে পার, তা আজীবন ধ'রে ক'রে যাও। সুখের ভিতর, বিলাসের ভিতর থেকেও আজীবন ধ'রে তিনি ঈশ্বরেরই আরাধনা ক'রে গেছেন। এ জন্যে লোক-জনের ভীড় থেকে আলাদা হ'য়ে নির্জ্জনে থাকতেই তিনি ভালবাসতেন। কখনো থাকতেন নৌকায় ক'রে নদীতে, কখনো জনশূন্য মাঠে তাঁবু ফেলে, কখনো বা হিমালয় পর্ব্বতের চূড়ায়। এই সব জায়গায় তিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেবল ঈশ্বরের আরাধনা ক'রেই কাটিয়ে দিতেন।

শেষ বয়সে তাঁর মন দিন-রাত ঈশ্বরে মগ্ন হ'য়ে থাকতো। তিনি তখন ব'লতেন—"এখন আমি নীড়ে মায়ের পাখার নীচে শুয়ে র'য়েছি। শীঘ্রই আমার পাখা উঠ্‌বে, তখন মায়ের সঙ্গে

অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়াবো। এ আনন্দ আর আমার মনে ধরে না।" মৃত্যুর কয়েক দিন আগে কেবলই তিনি ব'লতেন "এখন আমি কেবল তাঁকেই দেখছি—তাঁকেই দেখছি।" কখনো ব'লতেন "আমি বাড়ী যাব, আমি বাড়ী যাব।"

৮৭ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ অনন্ত লোকে গমন করেন। কেমন ক'রে, কি প্রণালীতে, বাইরের হাজার হাজার আকর্ষণ কাটিয়ে তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন, তা জানবার বিষয়। বড় হ'য়ে তোমরা তা জানবার চেষ্টা ক'রো—জীবন সার্থক হবে।

ছেলেবেলায়

রবীন্দ্রনাথের পিতার কথা—পিতামহের কথা তোমরা শুনলে। তাঁরা কত বড় ছিলেন,—তা দেখাবার জন্যেই তাঁদের কথা বিশেষ ক'রে বললুম। এবার রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন ছিল খুব বিচিত্র। বাড়ীর বাইরে যেতে না পেলেও মনে তাঁর আনন্দের অভাব ছিল না, সে কথা গোড়াতে ব'লেছি। গাছপালা, ফুলফল, পাখীর গান, মেঘ, জল, আকাশ এই সব দেখেই তিনি আনন্দে ভরপূর হ'য়ে থাকতেন। এ সমস্তই তাঁর সঙ্গে কথা কইতো।

কিন্তু লেখাপড়ার বাঁধাবাঁধির ভিতর যেতেই ছিল তাঁর যত আপত্তি। পড়ার নামে যত নিরানন্দ এসে হাজির হ'ত তাঁর মনে। তাঁর নিজের লেখা "ছেলেবেলা" বইয়ে নিজেই তিনি ব'লে গেছেন এই সব কথা। বলেছেন— "...মাস্টার মশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখ রগড়ানি। বারবার শুনতে হ'ত মাস্টার মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুখ্যু হয়ে থাকবার

মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম।...”

একটু বড় হ'য়ে তিনি অবশ্য তোমাদের মতোই স্কুলে যেতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাঁধাবাঁধির ভিতরে থেকে স্কুলের পড়াও তাঁর মোটেই ভাল লাগতো না। স্কুলের শাসন ছিল বিদ্‌ঘুটে ধরণের। পড়া ব'লতে না পারলে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত, আর হাতের উপর যত রাজ্যের শ্লেট্ চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। দুপুর রোদে খালি পায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত। আর মারধোর তো ছিল কথায় কথায়।

একদিকে চাকরদের শাসন, আর একদিকে মাষ্টারদের মার-ধোর,—এতে তাঁর কোমল মনটিতে বেদনা লাগতো নিশ্চয়, কিন্তু তা ব'লে তাঁর আনন্দস্রোতে বাধা পড়েনি। অতি সামান্য তুচ্ছ জিনিসও তাঁর কাছে আনন্দময়, রহস্যময় ঠেক্‌তো। বারান্দার এককোণে আতার বীচি পুঁতে রোজ তিনি জল দিতেন। সেই বীচি থেকে যে গাছ গজিয়ে উঠতে পারে, এ কথা মনে করে তাঁর কতই না বিস্ময়, কতই না আনন্দ হ'ত। এই পৃথিবীটাকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই বরাবর দেখে আসছেন। এর ভিতরের তলাটাতে না জানি কি আছে, এই কথাটা তিনি কতদিন ভাবতেন। কি করলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙএর মলাটটাকে খুলে ফেলা যেতে পারে, তার কত প্ল্যান্‌ই ঠাওরাতেন।

ভাবতেন, একটার পর একটা তার পর আর একটা বাঁশ যদি ঠুকে ঠুকে পোঁতা যায়, আর এমনি ক'রে অনেকগুলো বাঁশ পুতে ফেল্লে পর, পৃথিবীর নীচের তলাটার হয়তো নাগাল পাওয়া যেতে পারে। মাঘোৎসবের সময় কাঠের থাম পোঁতবার জন্যে উঠানে মাটি কাটা হ'ত। এই মাটি কাটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড়ই কৌতুকজনক ছিল। তিনি দেখতেন, গর্ত্ত বড় হ'তে হ'তে একটু একটু ক'রে সমস্ত মানুষটাই গর্ত্তের নীচে তলিয়ে যেতো, অথচ তার ভিতর দিয়ে যে পাতালপুরীতে যাওয়া যেতে পারে, তার কোনই সম্ভাবনা দেখা যেতো না। তাঁর মনে হ'ত, গর্ত্তটা যেন আর একটু বড় ক'রলেই ঠিক হয়; কিন্তু বড়রা সে দিকে গা ক'রতেন না দেখে তাঁর ভারি আপশোষ হ'ত।

স্কুলে তিনি যেতেন বটে, কিন্তু স্কুলের কোন-কিছুই তাঁর ভাল লাগতো না—ছেলেদেরও না, মাষ্টারদেরও না। একজন মাষ্টারের ব্যবহার এতই মন্দ ছিল যে, তিনি তাঁর ক্লাশে সকল ছাত্রের নীচে চুপটি ক'রে ব'সে থাকতেন—মাষ্টারের কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতেন না। সমস্ত বছরটা এইভাবে কেটে গেল। তার পর যখন বাংলার পরীক্ষা হ'ল, তিনি সকল ছেলের চেয়ে বেশী নম্বর পেলেন। তাঁর সেই মাষ্টারটি কিন্তু এটা মানতেই চাইলেন না। তিনি ব'ললেন, পরীক্ষা ঠিক-মতো নেওয়া হয় নি। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা নেওয়া হ'ল। এবারেও তিনি সকলের উপরে হ'লেন।

শুধু স্কুলের পড়াতে কি হয়! বাড়ীতে অনেক বেশী তাঁকে প'ড়তে হ'ত। চারুপাঠ, বস্তুবিচার,' প্রাণিবৃত্তান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে মেঘনাদবধ কাব্য পর্য্যন্ত। এ ছাড়া আরো অনেক কিছুই ছিল। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠে লঙ্‌টি প'রে প্রথমেই এক কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি ক'রতে হ'ত। তার পর সেই মাটিমাখা শরীরের উপর জামা প'রে সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ কাব্য, পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এই সব প'ড়তে হ'ত। স্কুল থেকে ফিরে এসেই ড্রয়িং আর জিম্নাষ্টিক্ ক'রতে হ'ত, সন্ধ্যার সময় ইংরাজি প'ড়তে হ'ত, তার পর রাত্রি ন'টার পর ছুটি। রবিবার সকালে গান শিখতে হ'ত।

ছেলেবেলায় তাঁর স্বাস্থ্য ছিল অসাধারণ রকমের ভালো। এ সম্বন্ধে তিনি ভারি মজার কথা বলেছেন। বলেছেন :— "...শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনো শরীরে কোনরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হোলো না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুস্‌খুস্নি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি। আর পেট-কামড়ানি ব'লে ভিতরে ভিতরে বদ হজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাইনি পেটে, কেবল দরকারমতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন,

একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয়নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, আচ্ছা যা মাস্টারকে জানিয়ে দে আজ আর পড়াতে হবে না।...."

স্কুলের পড়া বেশীদূর না এগুলেও বাড়ীতেই তাঁর শিক্ষার যা আয়োজন ছিল, তা খুবই বেশী। এ বিষয়ে তিনি অনেক ছেলের চেয়েই বেশী ভাগ্যবান ; আর এক মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, অনেক গুণী লোক সদাসর্ব্বদা তাঁদের বাড়ীতে যাতায়াত ক'রতেন। তাঁদের কেউ-বা কবি, কেউ বা গায়ক, কেউ-বা সাহিত্যিক, কেউ-বা দার্শনিক, কেউ-বা মহা ধার্ম্মিক। এঁরা সকলেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট খুব সমাদর পেতেন। বড় বড় পণ্ডিত—যেমন রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত ঠিক একেবারে তাঁদের আপনার লোক হ'য়ে গেছলেন। বই প'ড়ে যা শেখা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী শেখা যায় মানুষের সঙ্গ থেকে। নিজের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ যে-রকম শিক্ষা পেতে লাগলেন, সে-রকম শিক্ষা স্কুলেও হয় না—কলেজেও হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের আরম্ভ হয়, তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত আট বছর। এই আরম্ভটি ভারি সুন্দর। তিনি ব'লেছেন, "আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়।...একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।...পদ্য জিনিষটি এ পর্য্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি।...এই পদ্য যে

নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না।" তারপর গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তা পদ্য হ'য়ে উঠলো, তখন তিনি ভারি আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। ভয় একবার যখন ভাঙ্গলো, তখন আর পায় কে? দপ্তরখানায় একজন আম্‌লাকে ধ'রে অনেক কষ্টে একখানি নীলকাগজের খাতা জোগাড় ক'রলেন আর তাতে নিজের হাতে পেন্সিল দিয়ে কতকগুলো অসমান লাইন কেটে বড় বড় অক্ষরে পদ্য লিখতে সুরু ক'রে দিলেন।

পদ্য লিখে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অপরকে শোনানো যায় ততক্ষণ কি আর মজা হয়! রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে অলস ছিলেন না। তিনি যাকে-তাকে ধ'রে পদ্য শোনাতে আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর দাদা ছোট ভাইটির পদ্য রচনায় ভারি গর্ব্ব বোধ ক'রলেন আর বাড়ীর সবাইকে এক ধার থেকে তা শোনাতে লেগে গেলেন। বাড়ীর সবাই তো অস্থির! শুধু কি বাড়ীর লোক! তাঁদের জমিদারী কাছারীর আমলারা পর্য্যন্ত বাদ গেল না। তাঁর সেই নীল খাতাটি বাঁকা বাঁকা লাইনে আর সরু মোটা অক্ষরে ক্রমেই বোল্‌তার বাসার মতো ভ'রে উঠ্‌তে লাগলো। তিনি যে কবিতা লেখেন তা বাড়ীর বাইরেও যাতে র'টে যায়, এমন কি স্কুলের মাষ্টারদেরও যাতে কাণে যায় সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তোমরা এই দেখে বোধ হয় মনে মনে হাসছো। কিন্তু তোমরাও

কি ঠিক এই রকমটি কর না? তাঁর তখনকার কবিতা দু-একটি শুনবে? ভারি সুন্দর কিন্তু!

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

... ...

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

বড়দের ভিতর সমঝদার শ্রোতা তিনি খুব বেশী পেতেন না। অনেকেই আবার তাঁর কবিতা শুনে হাসতেন। একবার কেউ হাসলে, আর তিনি সে দিক মাড়াতেন না। কিন্তু শ্রোতার অভাব তাঁর মোটেই হয় নি। একটি খুব ভাল শ্রোতা তিনি পেয়েছিলেন। ইনি একজন বৃদ্ধ, নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। ইনি রবীন্দ্রনাথের পিতার একজন ভক্ত বন্ধু। এ রকম শ্রোতা আর মেলে না। ভাল লাগবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ রকমের ছিল। এই বৃদ্ধ একেবারে পাকা বোম্বাই আমটির মতো কোথাও একটুকুও আঁশ ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো, মুখের মধ্যে দাঁতের কোন বালাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এঁকে মনের সাধ মিটিয়ে কবিতা শোনাতেন। বৃদ্ধের স্বভাবের গুণে মানুষ মাত্রেই ছিল তাঁর আপনার। সর্ব্বদাই হাসি

রবীন্দ্রনাথ
বয়স ৯ বৎসর, পাশে সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ, বসিয়া—শ্রীকণ্ঠবাবু

মুখ দিনরাত একটি সেতার তাঁর কোলে কোলেই ফিরতো—কণ্ঠে গানের আর বিরাম ছিল না। গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর শিষ্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তাঁহার একটা গান ছিল—'ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকি বাঁসরী।' ঐ গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময়্ ছোড়োঁ,' সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভাললাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।"

বাড়ীর বাহিরে

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকে দূরে-দূরে থাকতেন। তাঁর পিতা তখন বাড়ীতে প্রায়ই থাকতেন না, দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে বেড়াতেন। পর্ব্বত, নদী, নির্জ্জন মাঠ এই রকম সব জায়গা ছিল তাঁর অতি প্রিয়। অনেকদিন বিদেশে থাকার পর অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন তিনি কলিকাতায় আসতেন, সমস্ত বাড়ী যেন গম্ গম্ ক'রতে থাকতো। সকলেই সাবধান হ'য়ে চ'লতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পাছে বারান্দায় গোলমাল ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি এজন্য পূর্ব্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।" এই রকম ভাবে দূরে দূরে থেকেই তাঁর কৌতূহল মিটতো, পিতার কাছ অবধি আর পৌঁছানো ঘ'টে উঠ্‌তো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন আশ্চর্য রকমে এই ব্যবস্থা বদ্‌লে গেল।

রবীন্দ্রনাথের তখন উপনয়ন হ'য়ে গেছে। তাঁর মাথাটি একেবারে নেড়া। নেড়া মাথা নিয়ে স্কুলে যাবেন কি ক'রে, এই হয়েছে তাঁর মহা ভাবনার কথা। এমন সময় হঠাৎ একদিন তেতলার ঘরে ডাক প'ড়লো। তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন তিনি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে যেতে চান কি না।

রবীন্দ্রনাথের তখন যে কি আনন্দ, তা ব'লে বোঝান শক্ত। তিনি বলেন, "'চাই' এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত।"

হিমালয়ে যাবার দিন তিনি পোষাক প'রে তাঁর পিতার সঙ্গে গাড়ীতে উঠলেন। তাঁর বয়সে এই প্রথম তিনি পোষাক প'রলেন। একটা জরির-কাজ-করা মখ্‌মলের টুপি হ'য়েছিল। মনে মনে আপত্তি থাকলেও সেটা তাঁকে নেড়া মাথার উপরেই প'রতে হ'ল। এর আগে তিনি কখন রেলগাড়ীতে চড়েন নি। ষ্টেশনে পৌছে তাঁর বেশ একটু ভয় ক'রতে লাগলো। কারণ, তিনি শুনেছিলেন, রেলগাড়ীতে চড়া এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার—পা ফস্‌কে গেলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু অতি সহজেই রেলগাড়ীতে উঠতে পারলেন দেখে, তিনি ভারি আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন।

তারপর গাড়ী ছুটে চললো। মাঠ, গাছপালা, গ্রাম ঠিক যেন ছবির ঝরণার মতো রেলগাড়ীর ছুদিক দিয়ে ছুটতে লাগলো। সন্ধ্যার সময় তিনি বোলপুরে পৌছলেন। এখানে কিছুদিন তাঁদের থাকবার কথা। বোলপুর সম্বন্ধে শুনে শুনে আগে থেকেই তিনি এর এক সুন্দর ছবি মনে মনে এঁকে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার ঝাপ্‌সায় অল্প-স্বল্প দেখলে পাছে সকাল বেলায় দেখবার পুরোপূরি আনন্দ না পাওয়া যায়, এই ভয়ে পাল্কীতে উঠেই চোখ বুজে রইলেন।

ভোরে উঠে বোলপুরের ছবি তাঁর কল্পনার সঙ্গে হয়তো মেলে নি, কিন্তু এখানে যা তিনি পেলেন, তাইতে তাঁর আনন্দের সীমা রইলো না। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করছে। মাঠে যেখানে খুসি তিনি ঘুরে বেড়াতে পেতেন। বোলপুরের মাঠে মাঝে মাঝে খোয়াই আছে। এই খোয়াই থেকে তিনি নানা রকমের পাথর জুড়ো ক'রতেন, আর সেগুলো জামার আঁচলে ভ'রে পিতার কাছে উপস্থিত ক'রতেন। তা দেখে তাঁর পিতা ভারি খুসি হ'য়ে ব'লতেন—কি চমৎকার! এ-সব তুমি পেলে কোথায়? রবীন্দ্রনাথ আহ্লাদে উথলে উঠে বলতেন—এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ এনে দিতে পারি। তাঁর পিতা বলতেন, তা হ'লে তো বেশ ভালই হয়। ঐ পাথর দিয়ে আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজিয়ে দাও।

খোয়াইয়ের ভিতর এক জায়গায় মাটি চুইয়ে একটা গর্ত্তের মধ্যে জল জমা হ'ত। এই গর্ত্ত ছাপিয়ে ঝির্ ঝির্ ক'রে জল ব'য়ে যেতো আর গর্ত্তের মুখে ছোট ছোট মাছ খেলা ক'রে বেড়াতো। তিনি তাই দেখে আহ্লাদে অধীর হ'য়ে পিতাকে এসে ব'লতেন, ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখে এসেছি, সেখান থেকে আমাদের স্নানের জল আর খাওয়ার জল আনলে বেশ হয়। তাঁর পিতাও তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য সেখান থেকেই জল আনবার ব্যবস্থা ক'রে দিতেন।

এখানে যে তিনি শুধুই বেড়িয়ে বেড়াতেন তা নয়, কবিতাও লিখতেন। একটি ছোট নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়িয়ে ব'সে আপন মনে রাশি রাশি কবিতা লিখে যেতেন।

বোলপুর থেকে বেরিয়ে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর এই সব জায়গা হ'য়ে শেষে তাঁরা অমৃতসরে পৌছলেন। অমৃতসরে মাসখানেক থেকে ড্যালহৌসি পাহাড়ে গেলেন। তাঁদের থাকবার জায়গা ঠিক হ'য়েছিল একটি পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায়। এখানেও তিনি নিজের মনে যেখানে খুসি যখন খুসি বেড়িয়ে বেড়াতেন। তাঁদের বাসার নীচের পাহাড়ে ছিল মস্ত এক কেলুবন। এই বনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ বিরাট দৈত্যের মতো মাথা উঁচু ক'রে কত শত বৎসর ধ'রে যে দাঁড়িয়ে ছিল তার ঠিক নেই। গাছগুলোর গা ঘেঁসে বেড়াতে তাঁর একটুও ভয় করতো না। তিনি লম্বা একগাছা লাঠি নিয়ে প্রায়ই এই বনে বেড়াতে যেতেন।

শুধু খেলা আর বেড়িয়ে বেড়ানো নয়। তাঁর পিতা তাঁকে লেখাপড়াও শেখাতেন। এখানে সব কাজই তাঁকে নিয়ম ধ'রে করতে হ'ত, যদিও তার ভেতর বাঁধাধরার ভাব ছিল না।

খুব ভোরে তাঁর পিতা তাঁকে তুলে দিতেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার থাকতো; সেই পাহাড়ের শীতে কম্বলের মুড়ি থেকে বেরিয়ে তত ভোরে তাঁকে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ ক'রতে হ'ত।

সূর্য উদয়ের সময় তাঁর পিতা তাঁকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে উপাসনা ক'রতেন। তারপর তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। বেড়িয়ে ফিরে এসে ঘণ্টাখানেক ইংরাজী পড়া চ'লতো, তারপর বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে স্নান। এই স্নান তাঁর বড়ই কষ্টের ছিল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর পিতা তাঁকে আর একবার পড়াতে বসাতেন। কিন্তু তখন যত রাজ্যের ঘুম এসে হাজির হ'ত। ঘুমে তিনি কেবলই ঢুলে প'ড়তেন। তাঁর অবস্থা বুঝে তাঁর পিতা তাঁকে ছুটি দিতেন। ছুটি পাওয়া মাত্রেই ঘুম কোথায় ছুটে পালাতো, তারপর লাঠি হাতে ক'রে এক পাহাড় হ'তে আর এক পাহাড়ে ছুটোছুটির পালা সুরু হ'ত।

এমনি ক'রে মাস কয়েক কাটালে পর তাঁর পিতা একজন লোকের সঙ্গে তাঁকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়ীর শিক্ষা

হিমালয় থেকে ফিরে এলে পর বাড়ীতে আর আগেকার ভাব রইলো না। চাকরদের শাসন গেল। বাড়ীর ভিতর যেখানে খুসি যাবার অধিকার পেলেন। তাঁর মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড় আসন তিনি দখল ক'রে ব'সলেন। তার পর গল্প আর গল্প—দিনরাত কেবল ভ্রমণের গল্প। ছাদের উপর সন্ধ্যাবেলায় তাঁর মায়ের বায়ু সেবনের সভায় তিনিই হ'লেন প্রধান বক্তা। তাঁর মা তাঁর মুখে ভ্রমণের গল্প শুনে ভারি খুসি হ'তেন।

বাড়ীর শাসনও যেমন ভেঙ্গে গেল, স্কুলে যাবার টানও তাঁর তেমনি কমে আসতে লাগলো। স্কুলের আইন-কানুন যা, তাতে সেটাকে ঠিক জেলখানা বা হাঁসপাতাল ব'লেই তাঁর মনে হ'ত। কিছুতেই তিনি নিজেকে এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতেন না। ছেলেবেলার এই কথা মনে ক'রে বড় হ'য়ে তিনি বোলপুরে নিজের মনের মতো ক'রে এক স্কুল করেন। কড়াক্কড়ির ভিতর ছেলেদের মন কি রকম মুস্‌ড়ে থাকে তা নিজে তিনি ভাল রকম

বুঝেছিলেন ব'লেই খেলা-ধুলোর ভিতর দিয়ে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে পরে তোমাদের বলবো।

তের বছর বয়সের সময় তাঁর মা মারা গেলেন। এর পর তাঁকে স্কুলে পাঠানো একেবারেই শক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। স্কুলের পড়ায় যখন কিছুতেই তাঁকে বাঁধতে পারা গেল না, তখন বাড়ীতেই ভাল করে পড়াবার ব্যবস্থা হ'ল। সংস্কৃত, ইংরাজি, বাংলা বাড়ীতেই তিনি প'ড়তে লাগলেন। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হ'লেও পড়ার তাঁর বিরাম ছিল না। এমন কোন বাংলা বই তখন ছিল না, যে তিনি তত ছোটবেলাতেই ভাল ক'রে প'ড়ে ফেলেন নি। কিন্তু লেখাপড়ার চেয়ে এক বিষয়ে তাঁর খুব বেশী ঝোঁক ছিল, সেটি হ'ল কবিতা রচনা। তাঁর বয়স যত এগুতে লাগলো, কবিতা-চর্চ্চাও তত বেড়ে চ'ললো। শুধুই কি কবিতা! যেমন কবিতা-চর্চ্চা তেমনি গান-চর্চ্চা। তাঁদের বাড়ীতে দিনরাত গানের হাওয়া বইতো ব'ললেই চলে। গান শুনে শুনে আর লিখে লিখে তাঁর মন গানের রাজ্যেই ঘুরে বেড়াতো।

অনেক গুণী লোক তাঁদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা ক'রতেন, এ কথা আগেই বলেছি। তাঁর দাদারাও ছিলেন সবাই গুণী। তাঁরা সাত ভাই। রবীন্দ্রনাথ সকলের ছোট। সমস্ত পরিবার এক সঙ্গে ক'রলে ভাইবোনে তাঁরা আরো অনেকগুলি। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যের

এক জায়গায় রূপক ক'রে তাঁর গুণী-ভাইদের পরিচয় বেশ সুন্দরভাবে দিয়েছেন,—

> "ভাতে যথা **সত্য হেম** মাতে যথা **বীর**
> **গুণ জ্যোতি** হরে যথা মনের তিমির।
> নব শোভা ধরে যথা **সোম** আর **রবি**
> সেই **দেব**-নিকেতন আলো করে কবি॥"*

এঁদের বাড়ীটি সত্যই একটি দেব-নিকেতন—গানবাজনা, হাসিগল্প, নির্দ্দোষ আমোদ-অহ্লাদে সদাই ভর পূর থাকতো। কত লোকের যে আনাগোনা ছিল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই বৃহৎ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সবাই গুণী, অনেকেই এঁরা বাংলার মুখ উজ্জ্বল ক'রেছেন। কাব্যে, গানে, চিত্রে, নাটক অভিনয়ে এঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি ও দার্শনিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যের ও সঙ্গীতের ওস্তাদ। স্বর্ণকুমারী দেবী শিক্ষায় ও জ্ঞানে বাংলার মেয়েদের গৌরব। অবনীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। এ দেশে ছবি আঁকার ধারা বদলে দিয়ে নিজে তিনি এক নূতন ধারার সৃষ্টি করেছেন। এঁদের বাড়ীটি গুণীলোকের ও জ্ঞানী-লোকের তীর্থস্থান ব'ল্‌লেই চলে।

আর একটি খুব বড় জিনিষ এঁদের বাড়ীতে ছিল, সেটি হ'ল স্বাদেশিকতা। স্বদেশের উপর রবীন্দ্রনাথের পিতার

* সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, সে কথা ব'লেছি। এই স্বদেশ-প্রীতির ভাবটি তাঁর বাড়ীর অপর সকলের মধ্যেও জেগে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের দাদারা সকলেই স্বদেশের ভক্ত ছিলেন। অথচ সে যুগটাকে মোটেই স্বদেশী যুগ বলা যেতে পারে না। তখন ইংরাজির দিকেই সকলের ঝোঁক। দেশের ভাব আর দেশের ভাষা এ দুটোই তখন দেশের লোকের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দাদারা তখনকার দিনে স্বদেশী ব্যাপার নিয়ে যে রকম মাতামাতি ক'রতেন তা দেখলে ভারি আশ্চর্য হ'তে হয়।

রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক স্বদেশী সভা ক'রেছিলেন। একটা গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসতো। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ছিলেন তার সভাপতি। রাজনারায়ণ বসুর মতো পণ্ডিত তখনকার দিনে অল্পই ছিল। তাঁর তখন চুল দাড়ি সবই প্রায় সাদা হ'য়ে গেছে। কিন্তু পাকা চুল আর পাণ্ডিত্য নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে তিনি ঠিক ছেলের মতোই মিশে যেতেন আর ছেলেদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইতেন—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁরা সব দুপুর বেলায় বাড়ী থেকে বেরুতেন আর চুপি চুপি সভা ক'রতে যেতেন। সভার কাজও হ'ত চুপি চুপি। সভার উদ্দেশ্য ছিল দেশী

রবীন্দ্রনাথ
১৪ বৎসর বয়সে

শিল্পের উন্নতি করা আর কলকারখানা বসানো। কলকারখানা নিয়ে ভারি মজার মজার ব্যাপার ঘটতো।

একবার সকল সভ্য একমত হ'য়ে ঠিক ক'রলেন, স্বদেশী দেশালাই তৈরী ক'রতে হবে। অনেক চেষ্টা ক'রে, অনেক পরীক্ষা ক'রে কয়েক বাক্স দেশালাই তৈরী হ'ল। কিন্তু এক এক বাক্সে এ রকম খরচ প'ড়তে লাগলো যে, সে খরচে গোটা একটা পাড়ার পূরো এক বছর ধ'রে উনুন ধরানো চ'লতো। তা ছাড়া সামান্য একটু অসুবিধা এই ছিল যে, কাছে-পিঠে আগুন না থাকলে সে দেশালাই জ্বালাতে পারা যেতো না। এই ধরণের আরো কত মজার কাণ্ড ঘট্‌তো।

তাঁদের বাড়ীর চেষ্টায় 'হিন্দুমেলা' ব'লে একটি মেলার আয়োজন হয়। এই মেলাতে দেশী শিল্প ও ব্যায়াম দেখান হ'ত, দেশের সাহিত্য আর সঙ্গীতের চর্চ্চা হ'ত, আর দেশী গুণী লোকদের পুরস্কার দেওয়া হ'ত। রবীন্দ্রনাথ এই হিন্দুমেলার এক অধিবেশনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটি কবিতা প'ড়েছিলেন। তার প্রথম লাইন হ'ল—"হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন'পরি।" তাঁর এই কবিতা শুনে সকলে মোহিত হন। সর্ব্বসাধারণের কাছে তাঁর আত্মপ্রকাশ এই প্রথম। এই হিন্দু মেলা আমাদের দেশের ছিল একটি অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান। আমাদের এই দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষকে স্বদেশ ব'লে ভক্তির সঙ্গে ধারণা ক'রবার চেষ্টা এই প্রথম। এই থেকে দেশের মধ্যে স্বদেশী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

ঠাকুর বাড়ী তখন ছিল সব দিক থেকেই বড়। কলিকাতার ভদ্র আর শিক্ষিত সমাজের চাল-চলন, আদব-কায়দা এঁদের আদর্শেই তৈরী হ'ত। শিল্পে, নাটকে, কাব্যে, সাহিত্যে এঁরাই দেশকে সব চেয়ে বেশী ধন্য ক'রেছেন, এ-কথা ব'ললে বেশী কিছুই বলা হ'ল না। আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে এঁরাই সব রকমে শ্রেষ্ঠ ক'রে তোলেন। 'ভারতী' পত্রিকা সে যুগের একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। এখন যে-সব বড় বড় মাসিক পত্র তোমরা দেখতে পাও, 'ভারতী' ছিল তার ভিতর সব চেয়ে পুরাতন। রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথকে সম্পাদক ক'রে এই কাগজ বার ক'রেছিলেন। 'ভারতী' বার ক'রে এঁরা নিজেদের বাড়ীতেই সাহিত্যের একটি চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ছিল মস্ত সুযোগ। তিনি মহা উৎসাহে লিখতে আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর কবিতা, গান, কাব্য, নানা রকমের প্রবন্ধ ভারতীতে বেরুতে লাগলো। তিনি শৈশবে ও কৈশোরে এত লিখেছেন যে তার হিসেব পাওয়া শক্ত। তাঁর সেই বয়সের বিস্তর কবিতা পৃথিবীর সেরা কবিতা ব'লে গণ্য হ'য়েছে। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে, ৯ বছর বয়সে তিনি শেক্সপীয়ারের "ম্যাক্‌বেথ" অনুবাদ ক'রেছিলেন। নিজেই তিনি বলেছেন "....আমার বয়স যখন ৯, আমি ম্যাকবেথ তর্জ্জমা করেছি।"

বিলাতে

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সতেরো, তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ব'ললেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে নিয়ে যাবেন। তাঁর পিতাও এতে মন দিলেন। বিলাত যাবার কথায় রবীন্দ্রনাথ একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন, এ যে একেবারে আশাতীত!

বিলাত যাবার আগে তিনি তাঁর মেজদাদার সঙ্গে আমেদাবাদ গেলেন। তিনি ছিলেন সেখানকার জজ। এখানে একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এ দেশের প্রথম সিভিলিয়ান। তাঁর আগে আর কেউ বিলাতে গিয়ে সিভিলিয়ান হ'য়ে আসেন নি। আমেদাবাদে শাহিবাগে ছিল জজের বাসা। এটি ছিল বাদ্‌শাহি আমলের এক প্রাসাদ। বাদশাহের জন্যই এই প্রাসাদটি তৈরী হ'য়েছিল। প্রাসাদের গা ঘেঁসে সবরমতী নদী তর্‌তর্ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছিল। নদীর তীরের দিকে প্রকাণ্ড এক খোলা ছাদ। রবীন্দ্রনাথের বৌদিদি ছেলেদের নিয়ে তখন বিলাতে। তাঁর মেজদাদা আদালতে চ'লে গেলে পর তত বড় বাড়ীতে তিনি ছাড়া আর কেউ থাকতো না। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা তাঁর কাছে বড়ই রহস্যময় ঠেকতো। মহা কৌতুহলে তিনি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াতেন। বড় বড় অক্ষরে ছাপা ছবিওয়ালা অনেক ভাল ভাল ইংরাজি বই ঘরের

দেওয়ালে খোপে খোপে সাজানো ছিল। এই হ'ল তাঁর সঙ্গী। তিনি এর ছবিগুলি বারবার দেখতেন। শেষে পড়া সুরু ক'রে দিলেন। কতক বুঝতেন, কতক বুঝতেন না; কিন্তু তাতে তাঁর পড়ার কোন বাধা হ'ত না। এই রকম ক'রে এখানে তাঁর ইংরাজি পড়া আপনা-আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেল।

এখানে কয়েক মাস থেকে তিনি তাঁর মেজদাদার সঙ্গে বিলাত যাত্রা ক'রলেন। তাঁর বয়স এই সময় সতেরো। এত অল্প বয়সে বিলাত যাওয়ার ফল তাঁর পক্ষে খুবই ভাল হ'য়েছিল। ছোট বেলায় ঘরের গণ্ডির ভিতর বন্ধ থেকে থেকে, যা কিছু বিদেশের, যা কিছু দূর দেশের, তাই তাঁর মনকে খুব বেশী রকম ক'রে টেনে নিতো। এতে তাঁর মনটি এ রকমের তৈরী হ'য়েছিল যে, যা কিছু ভাল—তা স্বদেশের হোক্, বিদেশের হোক্ চট্ ক'রে তাঁর মনের সঙ্গে গেঁথে যেতো। বিলাতে যাবার আগে সে দেশ সম্বন্ধে খুব বড় একটা ধারণা তিনি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলেন! সেখানে পৌঁছে সে দেশটা তাঁর কি রকম লেগেছিল, তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বেশ ভাল রকম জানা যায়। সে কথা এবার তোমাদের বলছি। তা ভারি চমৎকার।

বিলাত যাবার পথে তিনি প্রথমে যান ইটালীতে। ইটালীতে পৌঁছে তিনি তাঁর দাদাকে লিখলেন—

এই ত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়লো। জানোই ত আমি কি রকম কাল্পনিক। মনে করেছিলেম য়ুরোপে পৌঁছেই কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে।···কিন্তু ছেলেবেলা

থেকে দেখে আস্‌ছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য রাজ্যের প্রায় বনে না।···
কোন নূতন দেশে আসবার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর
মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বোলে মনেই হয় না।···
য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি।

ইটালী থেকে যান প্যারিসে। ভারি জম্‌কাল সহর এই প্যারিস। সেখান থেকে লিখলেন—

সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কি জম্‌কাল
সহর !...মনে হয়, প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। আমার মনে
হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে প্রকাণ্ড জম্‌কালো
বাড়ীগুলোর কি আবশ্যক। একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না,
সে হোটেলে থাকতে গেলেও আমার বোধ হয় তেমনি অসোয়াস্তি
হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক নেই।
স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি,
ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

বিলাতে পৌঁছে প্রথমটায় তিনি ভারি নিরাশ হ'লেন। তিনি ধারণা ক'রে রেখেছিলেন, ইংলণ্ড এতটুকু একটু দ্বীপ, আর এই দ্বীপের এ-ধার থেকে ও-ধার পর্য্যন্ত বড় বড় কবিদের কবিতায় আর বড় বড় পণ্ডিতদের বক্তৃতায় দিনরাত তোলপাড় হ'চ্ছে, আর তিনি এই দু-হাত জায়গার যেখানেই থাকুন না কেন, তা শুনতে পাবেন। তিনি ভেবেছিলেন, সেখানে সকলেই নানা রকম বিদ্যার আলোচনাতে দিনরাত মগ্ন। কিন্তু

সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, মেয়েরা বেশ-ভূষা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম্ম ক'রছে, সংসার যেমন চ'লে থাকে তেমনি চ'লছে। তাঁর ধারণার সঙ্গে কিছুই মিললো না দেখে তিনি হতাশ হ'লেন। সেখানকার ভীড়ভাড় আর বাইরের আড়ম্বর তাঁর কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেক্‌লো।

এখানকার সমাজের চালচলন আর ব্যবহার প্রথমটায় তাঁর ভাল লাগেনি। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন রইলো না। এখানে থাকতে থাকতে এখানকার যা ভাল, তা একে একে তাঁর চোখে প'ড়তে লাগলো। সব চেয়ে তাঁর ভাল লাগলো এখানকার স্বাধীনতা। আমাদের দেশের লোকজনের ভিতর কেমন একটা অবসন্ন ভাব—কারো ভিতর যেন স্ফুর্ত্তি নেই। কিন্তু এখানকার ছেলেপিলে, এখানকার লোকজন দেখে তাঁর ভারি ভাল লাগলো। তিনি তাঁর দাদাকে লিখলেন—

> এখানকার ছেলেদের এক রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। তার প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমানভাবে রাখে।···এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা হয় ত তুমি না দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবে না।··· এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্ত্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন করতে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীনভাব কোথা থেকে আসবে?···আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ।

বিলাতে পৌঁছে অল্পদিনের ভিতর সেখানকার এক স্কুলে তিনি ভর্ত্তি হ'লেন। স্কুলের ছেলেরা তাঁর সঙ্গে কিছুমাত্র খারাপ ব্যবহার করেনি। অনেক সময়ে তারা তাঁর পকেটের মধ্যে কমলালেবু, আপেল এই সব গুঁজে দিয়ে ছুটে পালাতো। তিনি বিদেশী ব'লেই তারা বোধ হয় এই রকম ব্যবহার ক'রতো। সেখানকার শিক্ষকদের তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। তাঁদের শিক্ষার ভিতর প্রাণের যোগ ছিল। এ জন্য তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা ক'রতেন।

বিলাতের সাধারণ লোকদের সম্বন্ধেও তাঁর ভাল ধারণা হ'য়েছিল। তিনি বলছেন—

> ...ষ্টেশনে প্রথম যখন পৌছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়ীতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটী অর্দ্ধক্রাউন ছিল, সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, সেই মুটে গাড়ীর পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্ব্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি, পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।

দেশে ফিরবার কয়েকমাস আগে তিনি ডাক্তার স্কট্ নামে এক গৃহস্থের বাড়ী ছিলেন। এই বাড়ীর চাল-চলন তাঁর ভাল লেগেছিল,—এরা ঠিক যেন নিজেরই লোক। এঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলাম। মিসেস্ স্কট্ আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এঁদের এখানে থাকতে থাকতেই তাঁর বাড়ী ফিরবার সময় হ'ল। দেশের আলো, দেশের বাতাস তাঁকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিচ্ছিল। এঁদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মিসেস্ স্কট্ তাঁর হাত দুখানি ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—এমনি করেই যদি চ'লে যাবে, তবে অল্প দিনের জন্যে তুমি এলে কেন ?

রবীন্দ্রনাথ এক বছর পরে বিলাত থেকে ফিরলেন। বিলাতের মাটিতে পা দিয়ে সেখানকার লোকজন আর সে দেশের চালচলন গোড়ায় তাঁর ভাল লাগেনি বটে, কিন্তু যখন তিনি দেশে ফিরলেন, অনেক জিনিষ শিখে আর সে দেশের লোকজনের উপর বেশ একটি শ্রদ্ধা মনে মনে পোষণ ক'রে দেশে ফিরলেন। সে-দেশ থেকে যা তিনি নিয়ে এলেন, তার ভিতর সব চেয়ে বড় একটি জিনিষ ছিল, সেটি হ'ল মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা। দেশের হোক্ বা বিদেশের হোক্ মানুষের প্রকৃতি, মানুষের মন সব দেশেই সমান। এ-দেশ, ও-দেশ, সব জায়গাতেই সমস্ত মানুষের মন এক। সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ জগতে সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ, এই সত্যটি তাঁর মনে দৃঢ় হ'য়ে গেল।

মিলনের সুর

বিলাত থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ গান আর কবিতার মধ্যে ডুব দিলেন। কবিতা-চর্চ্চা আর গানচর্চ্চা ছাড়া অপর কোনই কাজ আর তাঁর রইলো না। তিনি কখনো বা সমুদ্রের ধারে, কখনো পাহাড়ে, কখনো বা নৌকায় গঙ্গার উপর বাস ক'রতে লাগলেন। এই সময়টা ঘরের কোণে, চুপটি ক'রে বসে থাকবার মতো তাঁর মনের অবস্থা নয়। কোন রকম একঘেয়েমি তাঁর ভাল লাগতো না। তার চেয়ে মনে হত—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুঈন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন!

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি'
চলেছি নিশিদিন;"

আর কেবলই তাঁর মনে হ'ত—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে'
জীবন উচ্ছ্বাসে।

শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে!
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।"

মনের এই রকম উদ্দাম ভাবের ভিতর দিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগলো। কবিতার আর বিরাম নেই—গানেরও বিরাম নেই। গানের সুর অনবরত তখন তাঁর কণ্ঠে লেগে থাকতো। প্রহরের পর প্রহর গান গেয়েও তাঁর ক্লান্তি বোধ হ'ত না। তাঁর কণ্ঠের গান যে কি মধুর, তা যে শুনেছে, সে-ই জানে। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে, তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার তাঁকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। সে ব্যাপারটি ভারি সুন্দর। রবীন্দ্রনাথেরই মুখে তা শোন—

রবীন্দ্রনাথ

প্রথম 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ে—বয়স ২০ বৎসর

"একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি কতকগুলি গান তৈরী করিয়াছিলাম। পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হার্ম্মোনিয়মে জ্যোতি দাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল। গান গাওয়া যখন শেষ হইল তিনি বলিলেন, দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে ত তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে যখন ছিলেন, সেখানেও তাঁর গান চর্চ্চা বন্ধ ছিল না। গানের জন্য বিলাতের ভদ্রসমাজে তাঁর খুব আদর হ'য়েছিল। তিনি বিলাতী গানও বেশ আয়ত্ত ক'রেছিলেন। দেশে ফিরে দেশী আর বিলাতী সুর মিলিয়ে তিনি এক গীতিনাট্য লিখলেন—তার নাম 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। এই বাল্মীকি-প্রতিভা তাঁদের বাড়ীতে অভিনয় হয়—নিজে তিনি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর বয়স যখন বাইশ বছর, সে সময় তাঁর বিবাহ হয়।

তাঁর তখনকার দিনগুলি ছিল আনন্দের দিন, নির্ভাবনার দিন। এই বিশ্ব-সংসারের সব-কিছুই তখন তাঁর কাছে সুন্দর। তাঁর মন তখন আনন্দে একেবারে ভরপুর। ছোট শিশু

যেমন ধুলো, বালি, ঝিনুক, শামুক, যা-খুসি তাই নিয়ে খেলতে পারে আর তাতেই তার আনন্দ উথলে উঠে, তিনিও তেমনি চোখের সামনে যা দেখতেন, তারই সঙ্গে নিজের মনের সুর মিলিয়ে দিতেন। রাস্তা দিয়ে মুটে মজুর চ'লে যাচ্ছে, মা ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা গরু আর একটা গরুর গা চেটে দিচ্ছে, এ সকল তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার! এ সব তো তোমার-আমার চোখের সামনে দিনরাত ঘ'টছে, আমরা তা দেখেও দেখি না। কিন্তু এই সব তুচ্ছ জিনিষই তাঁর মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাব জাগিয়ে দিতো, তা আর বলা যায় না! তিনি গাইছেন,—

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখী বসিয়া চোখাচোখি,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি।
... ...
পরাণ পুরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।
... ...
প্রভাত হল যেই, কি জানি হল এ কি!
আকাশপানে চাই, কি জানি কারে দেখি!"

রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরের এই যে সুর, এইটিই হ'ল বিশ্বজগতের মিলনের সুর। তাঁর সমস্ত গান আর কবিতার ভিতর দিয়ে এই সুরটিই ক্রমশ বেজে উঠ্‌তে লাগলো। জীবনের পথে যেমন-যেমন তিনি এগিয়ে চললেন, এই মিলনের সুরও তেমনি উঁচু হ'তে আরো উঁচু পরদায় উঠ্‌তে লাগলো। মিলনের গান গাওয়াই হ'ল তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা। তিনি গাইলেন—

হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ বহে' যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই।

এই রকমের শুধু গান গেয়ে-গেয়েই তাঁর জীবনের তিরিশটি বছর কেটে গেল। বাকি জীবন বোধ হয় তাঁর এমনি ভাবেই কেটে যেতো, কিন্তু তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সময় তাঁর উপর জমিদারি কাজ দেখবার ভার দিলেন। কাজকর্ম্মের নামে প্রথমটায় তাঁর ভয় হ'ল, কিন্তু পিতার আদেশ। শেষে তিনি রাজি হ'য়ে তাঁদের জমিদারি শিলাইদাতে গেলেন।

শিলাইদা অতি সুন্দর স্থান। বিস্তীর্ণ পদ্মানদী পাশ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। খোলা মাঠ, খোলা আকাশ—সহরের গোলমাল এখানে নেই। জায়গাটি তাঁর বড়ই ভাল লাগলো। সব চেয়ে ভাল লাগলো পদ্মা। তিনি নৌকোতে করে পদ্মার উপরেই বাস ক'রতে লাগলেন। নৌকোতেই শোওয়া, বসা, ঘুমোনো খাওয়া কাজ-কর্ম্মকরা—অথাৎ নৌকোই ছিল তাঁর বাড়ী। শুধু থাকা নয়, নৌকোয় ক'রে প্রায়ই তিনি বেড়াতেন। ছোট-খাট গ্রাম, ভাঙা-চোরা ঘাট, টিনের ছাদওয়ালা বাজার, বাখারির বেড়া দেওয়া গোলাঘর, বাঁশ ঝাড়, আম, কাঁঠাল, কুল, খেজুর শিমুল, কলা, আকন্দ, ওল, কচু, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, ধানের ক্ষেত এই সকলের পাশ দিয়ে নৌকোয় করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে সত্যিকারের বাঙলা দেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'তে লাগলো। তা ছাড়া আর এক জিনিষ তিনি এখানে পেলেন,—সে হ'ল বাঙলা দেশের মানুষ।

কাজের নামে গোড়াতে তাঁর ভয় হয়েছিল বটে, কিন্তু কাজের ভিতর গিয়ে পড়াতে, সে ভাব আর রইলো না।

জমিদারির কাজে অল্পদিনেই তিনি পাকা হ'য়ে উঠলেন। গরীব প্রজাদের দুঃখের দুঃখী হ'য়ে কিসে তাদের ভাল হবে সে দিকে তিনি মনোযোগী হ'লেন। তাঁর কাব্যজীবন আরম্ভ হ'য়েছিল শিশুকালেই, এবার থেকে কর্ম্মজীবন আরম্ভ হ'ল।

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ ক'রে তাঁর কবি-মন সংসারকে কি চোখে দেখতে লাগলো, তার কয়েকটি ছবি এবার তোমাদের সামনে ধ'রতে চাই। সেগুলি অতি অপূর্ব্ব। কবির নিজের কথাতেই তা শোনাই। তিনি কি বলছেন, শোন—

যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্চি ততই কাজ জিনিষটার পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়চে। কর্ম্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করচি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা; কাজের মধ্য দিয়েই জিনিষ চিনি—মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে।...

* * * *

আমি বিকালে সন্ধ্যার দিকে···অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি—পূর্ব্বদিকে যখন ফিরি, এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি, আর এক রকম দেখতে পাই—আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হ'তে থাকে—আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা

গর্জিয়ে উঠচে—আমি নতুন প্রাণ এবং নতুন বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারি সহজ হয়ে পড়চে!…

* * * *

ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্য্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্য্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই।…আমার মনে হয়, এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারচিনে।…

পল্লীগ্রামের লোকজন আর তাদের সাধাসিধে চাল-চলন বড়ই তাঁর ভাল লাগলো—

যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিংবা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত তাই করচে।…বাস্তবিক বড় বড় উদ্যোগ এবং লম্বা-চৌড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোট ছোট কর্ত্তব্য-সমাধাদ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে।…কবিত্বই বলো আর বীরত্বই বলো কোনটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে, বসে বসে হাঁস ফাঁস করা, কল্পনা করা, কোন অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে

সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর কিছু হোতে পারে না।...

এই সমস্ত···অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড় একটি কোমল মাধুর্য্য আছে। বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষাদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে।···এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না।··· সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মত, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়।···

পদ্মার উপর তাঁর অসাধারণ টান। পদ্মার কথা তিনি কত রকমে কতভাবে যে ব'লেছেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না।

* * * *

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্ত্তা। এখানে আমার উপরে আমার সময়ের উপরে আর কারো কোনো অধিকার নেই।···যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুসি পড়ি, যত খুসি লিখি এবং যত খুসি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন মনে এই আকাশপূর্ণ, আলোকপূর্ণ, আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।...বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মা আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশী

পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম ;—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।

* * * *

পদ্মার উপর তাঁর কি গভীর ভালবাসা !

হে পদ্মা আমার !
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।

... ...

কতদিন ভাবিয়াছি বসি' তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,

... ...

কত গ্রাম, কত মাঠ, কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাড়,
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?

... ...

আর বার সেই তীরে, সে সন্ধ্যাবেলায়,
হবে না কি দেখা-শুনা তোমায় আমায় ?

গানের রাজা

এক এক জন মানুষ এক এক রকম কাজের অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। রবীন্দ্রনাথ ধনবান। বড় জমিদার। কিন্তু ধনের হেপাজত করা বা জমিদারি নিয়ে থাকাই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ নয়। অপর কোন একজন সাধারণ মানুষের জীবনে এ সকলের সংযোগ হ'লে তার জীবন ধন্য হ'য়ে যেতো,—সে মনে ক'রতো জগতে আর কিছুই তার করবার নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিকট এ সকল অতি তুচ্ছ—এগুলো কেবল এক একটা অবলম্বন মাত্র। ধন-সম্পদ আর পদ-গৌরবকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর জীবন ক্রমাগত বড়র দিকেই এগিয়ে চ'লেছিল।

কিন্তু বড়র দিকে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনাও ছিল অসাধারণ রকমের। বড় হ'তে হ'লে সাধনা চাই, পরিশ্রম চাই। বিনা সাধনায়, বিনা পরিশ্রমে জগতে কেউ কি কখনো বড় হ'তে পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন নৌকায়—পদ্মার উপর। সেখানে লোকজনের সমাগম ছিল না, বাইরের কোলাহল সেখানে তাঁকে ত্যক্ত ক'রতো না। দেখা যেতো শুধু জলরাশি আর পদ্মার নির্জ্জন তীরভূমি। এখানে তিনি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি নিজের লেখা নিয়েই মগ্ন থাকতেন। সর্ব্বদা লেখার আনন্দে, এ রকম বিভোর

হ'য়ে থাকতেন যে, খাওয়া দাওয়া এক রকম তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন। যা খেতেন তাও খুব সামান্য—একেবারে নাম মাত্র। আর ঘুম! ঘুম কাকে বলে, তা তিনি এ সময় ভুলেই গেছলেন। বাংলার পল্লীতে রবীন্দ্রনাথের তখনকার দিনগুলি এই রকম অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে কেটেছিল, আর এরই ফলে তিনি অসাধারণ ভাব-সম্পদের অধিকারী হ'তে পেরেছিলেন।

আগেই বলেছি, পল্লীগ্রামে এসে রবীন্দ্রনাথ একেবারে সমস্ত বাংলা দেশকে পূরোপূরিভাবে পেলেন। শুধু কেবল বাংলাদেশকে পাওয়া নয়, সমস্ত পৃথিবীটাকেই তিনি এই সঙ্গে পেয়ে গেলেন, ব'লতে, হবে। কি রকম ভাবে পেলেন, তা তাঁর নিজের কথাতেই শোন—

ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে, ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা, নদী, মাঠ, কোলাহল, নিস্তব্ধতা, প্রভাত, সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে কিন্তু এমন কোমলতা দুর্ব্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষ গুলির মত এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখ-দুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত

দরিদ্র• মর্ত্ত-হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে। ......আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর বেশী ভালবাসি।......

এই ভালবাসার কি তুলনা আছে! এই পৃথিবীর গাছ-পালা, নদী, মাঠ, লোকজন সবাই তো দেখে, কিন্তু দেখে এমন ক'রে ভালবাসে ক'জন? শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ, হেমন্ত বসন্ত এই সব ঋতুর আবির্ভাবে তাঁর মনে নব নব ভাবের উদয় হ'ত। প্রকৃতির লীলার ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের বাংলা-মায়ের যে অপরূপ মূর্ত্তি দেখেছেন, তার তুলনা নেই—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝরিছে অমল শোভাতে।
মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গেও তিনি যেতে চান না। তাই তিনি বলেছেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে।
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।

তাঁর এই ভালবাসা কত বিচিত্র ভঙ্গিতে যে প্রকাশ পেয়েছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। পদ্মা যেমন চল্ চল্ ছল্ ছল্ ক'রে অবিশ্রান্ত চ'লেছে, তাঁর প্রাণের ভাবও তেমনি নানা ছন্দে, নানা তালে ফুটে উঠেছে—অফুরন্ত গানে আর অজস্র কবিতায়। পদ্মার জলধারার মতো তার আর বিরাম নেই।

তিনি গানে কবিতায় আমাদের এই মাতৃভূমিকে কত ভাবেই না পূজা করেছেন!

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা॥
... ...
তোমার কোলে জনম আমার
মরণ তোমার বুকে;
তোমার পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।

তোমরা তাঁর "কথা" কাব্যটি পড়েছ নিশ্চয়। এই "কথা" কাব্যের ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের বীরপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী কি চমৎকার ক'রেই তিনি ব'লেছেন। শুনলে মন একেবারে মেতে ওঠে। তার এক-আধটি মনে করিয়ে দিই। তোমাদের অনেকেরই হয়তো মুখস্থ আছে,—

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ্—
নির্ম্মম নির্ভীক্।
... ...
পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্তলহরী
মুক্ত হইল 'ক রে!
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।

বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরা'ল
পঞ্চ নদীর তীরে।

তাঁর কবিতা আর গান রূপ ধারণ ক'রে আমাদের সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে, তাঁর এক একখানি বইয়ে। যেমন—

সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, খেয়া, উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা, স্মরণ, পূরবী, মহুয়া, পত্রপুট, বিচিত্রা, শ্যামলী, শিশু, শিশুভোলানাথ—আর কত নাম করবো! এই সকল বই যে কি অমূল্য সম্পদ আমাদের মধ্যে বিতরণ ক'রছে, তা বুঝতে পারাও মহা ভাগ্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট গল্প আর এক অপূর্ব্ব জিনিষ। কবিতায় আর গানে যেমন তিনি সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, ছোট ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে তেমনি তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা সহানুভূতি প্রভৃতি অন্তরের ভাবগুলি কি চমৎকার ক'রেই না ব্যক্ত ক'রেছেন! এ ছাড়া প্রবন্ধে, ব্যঙ্গ-কৌতুকে ও হাস্যরসে তাঁর সমকক্ষ আর একজনও বোধ হয় নেই। তাঁর নাটকগুলির এক একখানি, যেমন—বাল্মীকিপ্রতিভা, বিসর্জ্জন, মায়ার খেলা, চিরকুমার সভা, শারদোৎসব, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ প্রভৃতি এক একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। তাঁর অচলায়তন, ফাল্গুনী, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি নাটকের ভিতরের কথা যা, তা সকল দেশের, সকল মানুষের মনের মধ্যে চিরকাল ধ'রে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। আর তা এমনই এক আশ্চর্য্য সুরে বাঁধা যে, সকল দেশের সকল মানুষের মনে এক সঙ্গে তা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। তাঁর ডাকঘর নাটকটির অমলের কথা শুনলে, তাঁর নিজেরই শিশু বয়সের কথা মনে আসে। ডাকঘরের অমল ঠিক যেন তিনি নিজে—

যখন তিনি চাকরদের শাসনে ঘরের ভিতর চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে জানালার ভিতর দিয়ে বাইয়ের জিনিষ তন্ময় হ'য়ে দেখতেন, আর কত কি ভাবতেন। তাঁর উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটি এত উঁচু ভাবের যে, তা আমাদের সাহিত্যের ধারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে। আর সেই ধারা ধ'রে আমাদের সাহিত্যে কত যে নূতন নূতন ভাবের উপন্যাস ও গল্প সৃষ্টি হ'য়ে চ'লেছে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।

আর তাঁর গান! তার তো তুলনাই নেই। রবীন্দ্রনাথের গান সারা বাংলা দেশকে ছেয়ে রেখেছে। তাঁর গান আমাদের মাঠে ঘাটে রাখাল বালকেরা গেয়ে বেড়ায়। সভায়, মজলিসে তাঁর গান না হ'লে লোকের আনন্দ হয় না। দেশের পূজায় তাঁর গানেরই স্থান সকলের আগে। গান দিয়ে তিনি বাংলা দেশকে আর বাঙালীকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী॥

ও মা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

এই গান শুনে এমন কে আছে যে আনন্দে নেচে ওঠে না! আর—

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই।
মগন মিথ্যা কাজে॥
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি,
ধর গো পূজার থালি,
রতন-প্রদীপখানি
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি ল'য়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল ডালি,
মা'র আহ্বান-বাণী
রটাও ভুবন মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে॥

এই শঙ্খ-রব শুনে এমন কে আছে যে, ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে প'ড়তে চায় না!

মায়ের ডাকে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে তিনি যেমন ক'রে মিলিয়েছেন, তেমনটি আর কি কেউ পেরেছে?

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে॥
... ...

যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে ॥
মান অপমান গেচে ঘুচে,
নয়নের জল গেচে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥

বাংলার ভাইবোনকে কি সুন্দর ক'রেই না তিনি এক ক'রেছেন!

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক
এক হউক
এক হউক
হে ভগবান ॥

কিন্তু শুধু কি তিনি বাংলারই কবি! শুধু কেবল বাংলার ভাই বোনকেই কি তিনি এক ক'রতে চেয়েছেন? তা নয়। সমস্ত জগৎটাই যে তাঁর আপনার!

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তা'রে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

এই রকম ক'রে জগতের প্রত্যেককে তিনি এক সুরে বাঁধতে চেয়েছেন। এই জন্যই তিনি জগতের কবি—এই জন্যই তিনি মহামানব ও জগৎপূজ্য।

স্বর্ণ-মুকুট

রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হ'লে পর বোলপুরে তাঁর স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষকেরা মিলে তাঁর জন্মোৎসব করেন, আর তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য দেন। তারপর কলিকাতার টাউনহলে সমস্ত বাঙালী একত্র হ'য়ে এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। কবিকে সম্মান দেখানো আর সম্বর্দ্ধনা করা এই সভার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনের পঞ্চাশটি বছর পূর্ণ ক'রেছেন, আর এই পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে কাব্য, কবিতা, গান, বক্তৃতার ভিতর দিয়ে এত রকম ভাব, এত রকম নূতনত্ব, এত রকম শক্তি আমাদের সাহিত্যে তিনি দিয়েছেন যে, তার প্রভাবে বাঙালীর মুখ জগতের কাছে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করবার যে রকম আয়োজন হ'য়েছিল, সে রকম আয়োজন এর আগে কেউ দেখেন নি। সম্বর্দ্ধনার দিন প্রকাণ্ড টাউন হলের কোনখানে একটি তিল রাখবারও ঠাঁই ছিল না— সমস্তই লোকে ভ'রে গেছলো। একটু দেরীতে এসে বিস্তর লোককে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা ফিরে যেতে হ'য়েছিল। সে সভায় বাংলা দেশের যত বড় বড় লোক একত্র হ'য়েছিলেন। দেশের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে, মানে, অর্থে, বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, সে রকম অনেক লোক সে দিন উপস্থিত ছিলেন। জজ, ব্যারিষ্টার, রাজা,

মহারাজা, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অর্থাৎ দেশের যাঁরা সেরা লোক, এই সম্বর্দ্ধনায় সবাই তাঁরা যোগ দিয়াছিলেন। বালক, বৃদ্ধ আর স্ত্রীলোকেরাও বাদ ছিলেন না। লোকের এ রকম আগ্রহ আর দেখা যায়নি। সব চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা গেছলো ছেলেদের ভিতর আর যুবকদের ভিতর। কবিকে সম্বর্দ্ধনা করবার সুযোগ পেয়ে বাঙালীর আনন্দ যেন আর ধ'রছিল না।

বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা
হে কবি! তোমায় বরি হে আজি,–
বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া
বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।
অযুত আঁখির উজল আলোকে
হে কবি! তোমায় আরতি করি,
অযুত হিয়ার শুভ-কামনার
শুভ্র শোভন চাঁদোয়া ধরি।

এই কথাগুলিই ছিল সেদিনকার সকলের প্রাণের কথা। কবিকে প্রথমে রৌপ্য পাত্রে ক'রে অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল। তারপর একটি স্বর্ণ সূত্রের হার আর একটি ফুলের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়া হ'ল। সোনার থালাতে ক'রে উপহার দেওয়া হ'ল একটি বহুমূল্যবান সোনার পদ্ম ও হাতীর দাঁতের ফলকে খোদাই-করে-লেখা সুন্দর এক অভিনন্দন,—আর এই সকলের

রবীন্দ্রনাথ

সঙ্গে দেওয়া হ'ল সমস্ত বাঙালীর শ্রদ্ধা, প্রীতি আর সম্মান। কবিকে অভিনন্দন ক'রে বাঙালী সেদিন গর্ব্বে উঁচু হ'য়ে উঠে বলেছিল—

জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব ॥
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী, তব প্রতিভা গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। তিনি শুধু কবি নন, তিনি বক্তা, তিনি একজন ভাল অভিনেতা, তিনি সমাজ-সংস্কারক, তিনি ধর্ম্মসংস্কারক, তিনি দেশহিতৈষী—একাধারে তিনি সব। এত রকম ভাবের সমাবেশ এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীতে অপর কোন মানুষের জীবনে বোধ হয় আর দেখা যায়নি। তাঁর প্রতিভা শুধু বাংলার মধ্যেই যে আট্‌কে রইলো তা নয়, বাংলা দেশ ছাড়িয়ে—দিগ্‌বিদিকে তা ছড়িয়ে পড়লো। শেষে, সাগরের ও-পারে ইংলণ্ডে আর ইউরোপের অন্য সব দেশেও সাড়া প'ড়ে গেল।

১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা ক'রলেন। এই সময় তিনি তাঁর কতকগুলি কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে ইংরাজী গীতাঞ্জলি বার ক'রলেন। এই গীতাঞ্জলির গানগুলি সে দেশের লোককে একেবারেই মাতিয়ে তুললে আর তিনি

সেখানকার সেরা সাহিত্যিক, শিল্পী ও মনীষীদের নিকট বিপুল সম্মান লাভ ক'রলেন।

তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তা'র পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে, আসে, আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী—
সে যে আসে, আসে, আসে!

এ ভাবের গান সে দেশের লোকে আগে কখনো শুনে নি।

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

... ...

তোমারে জানিলে কেহ নাহি পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

পরকে এ রকম ক'রে আপনার ক'রে নিতে আর তো কেউ তাদের বলে নি!

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো॥

নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

এই বিশ্বব্যাপী মহামিলনের গান শুনে তারা স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
... ...
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

গীতাঞ্জলির এই অপূর্ব্ব বাণী শুনে তাদের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। ভারতের কবির কাছে ইউরোপের কবিরা নতি স্বীকার করলে। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ জগতের কবি-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেলেন।

তারপর তাঁর গৌরব আরো চরমে উঠ্‌লো। বিদেশীদের কাছ থেকে উচ্চ সম্মান লাভ ক'রে দেশে ফিরে আসবার সঙ্গে

সঙ্গেই তিনি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পুরস্কার 'নোবেল-পুরস্কার' লাভ করলেন। এই 'নোবেল পুরস্কার'টি কি, তা একটু বিশেষ ক'রে বলা দরকার।

'নোবেল' সুইডেনের একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক ডাক্তার। এঁর পূরো নাম আলফ্রেড্ নোবেল। ইনি খুব সহজ উপায়ে ডিনামাইট্ তৈরী করবার কৌশল বার করেন, আর এই থেকে কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর উপার্জ্জনের টাকা নিজের আত্মীয়-স্বজনকে না দিয়ে জগতের হিতের জন্যই সমস্ত দান ক'রে যান। এ সম্বন্ধে এক সুন্দর যুক্তি তিনি তাঁর উইলে লিখে গেছেন। তিনি ব'লেছেন, নিজে উপার্জ্জন না ক'রে কেউ যদি উত্তরাধিকার-সূত্রে খুব বেশী টাকা পায়, তবে সে অলস হ'য়ে ওঠে আর তার মস্তিষ্কের ভাল রকম বিকাশ হয় না। কাজে কাজেই, ধনী লোকদের উচিত, ছেলে-মেয়েদের খুব বেশী টাকাকড়ি না দেওয়া। কারণ, বিনা চেষ্টায় অনেক টাকা পেয়ে তারা অলস হ'য়ে প'ড়বে—জগতের তারা কোন উপকারেই আসবে না।

আলফ্রেড্ নোবেল উইল করে যান যে, তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে প্রত্যেক বৎসর পাঁচটি বিষয়ের জন্য পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হবে। সে পাঁচটি বিষয় এই—সাহিত্য, রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, আর জগতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা। এই পাঁচটি বিষয়ে সব চেয়ে উন্নতি ক'রেছেন বা আদর্শের সৃষ্টি ক'রেছেন,

এ রকম পাঁচজন লোক প্রত্যেকে এক লক্ষ বিশ হাজার ক'রে টাকা প্রতি বছর পুরস্কার পেয়ে থাকেন।

১৮৯৬ নালে ৬৩ বছর বয়সে আলফ্রেড্ নোবেলের মৃত্যু হয়। নোবেল-পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয় ১৯০২ সাল থেকে। এতদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের লোকেরাই এই পুরস্কার পেয়ে আসছিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে—শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত এশিয়ার মধ্যে আমাদের রবীন্দ্রনাথই ১৯১৩ সালে সব প্রথম এই পুরস্কার পান। নোবেল-পুরস্কারের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা নিজে না নিয়ে, সমস্তই তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনে দান করেন।

নোবেল-পুরস্কারে রবীন্দ্রনাথ একাই যে সম্মানিত হ'য়েছেন তা নয়, তাঁর এই সম্মানে সমস্ত বাঙালীর, এমন কি সমস্ত ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে জগতের সাহিত্য-সভার শ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন, এ কি বাঙালীর কম গৌরব! কিছুদিন আগে সম্বর্দ্ধনা-সভায় যে বলা হ'য়েছিল—

জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।

এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

তারপর, আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও রবীন্দ্রনাথকে ডি-লিট্ (ডক্টর অব লিটারেচার) অর্থাৎ সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দেন। এই উপাধিতে তাঁর সম্মান বেশী আর কি বাড়বে! তাঁকে উপাধি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেরই বরং ধন্য হওয়ার কথা।

গবর্মেণ্ট থেকে তিনি 'নাইট' উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ঐ উপাধি গবর্মেণ্টকে ফিরিয়ে দেন। পাঞ্জাবে তাঁর দেশের লোকের উপর অত্যাচারের কথা শুনে তিনি এই উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, তাঁর অসহায় দেশী ভাইদের পাশেই তিনি দাঁড়াতে চান, উপাধি ধারণ ক'রে তাদের কাছ থেকে তিনি আলাদা হ'য়ে স'রে থাকতে চান না। তিনি সকল উপাধির উপরে। তাঁর কোন উপাধি থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি!

বিশ্ববিজয়

শুধু নোবেল-পুরস্কার লাভই যে রবীন্দ্রনাথের সেবা গৌরব, তা নয়। ১৯২০ সালে আবার তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান। বিদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার সব-কিছুই খারাপ—সে সকলে আমাদের কোনই দরকার নেই, এমন কথা তিনি বলেন না। কিন্তু তা ব'লে আমরা বিদেশের খালি নকলই ক'রবো, এ অবশ্য তিনি চান না। পৃথিবীর অপর সব জাতির তুলনায় আমাদের সভ্যতা অনেক পুরাতন,—আমরাই বা খাটো কিসে? ভিখারীর মতো আমরা বিদেশীদের কাছে শুধু চাইবার জন্যই যাবো কেন? আমরাও তাদের কাছ থেকে নেব, তারাও আমাদের কাছ থেকে নেবে। এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এ-যাত্রায় বিদেশের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলমাল্য পেয়েছিলেন।

কিন্তু এবার তাঁর ইউরোপে গিয়ে পৌঁছবার ঢের আগেই তাঁর গীতাঞ্জলির বাণী সেখানকার নানা দেশে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। তাঁর গীতাঞ্জলি সে সব দেশে যে কি রকম আদর পেয়েছিল, তা ব'লে শেষ করা যায় না। গুণী লোকেরা যে যে-রকমে পারেন গীতাঞ্জলির রস গ্রহণ ক'রেও যেন তৃপ্ত হ'চ্ছিলেন না। এই নিয়ে কত রকমের আলোচনাই সেখানকার লোকেরা ক'রতেন। ফরাসী দেশের এক কাগজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভারি

সুন্দর সুন্দর কথা একবার বেরিয়েছিল। তার কতক কতক এখানে তুলে দিচ্ছি। ফরাসী ভদ্রলোকটি লিখেছেন—

'ঠাকুর-মহাশয় মা সরস্বতীর একজন বরপুত্র। তিনি এমন সুন্দররূপে নিজ ভাষাতে তাঁহার গানগুলি রচনা করিয়াছেন যে, মা সরস্বতীর কৃপায় ও সহায়তায় তাঁহার অনুবাদকগণও সুচারুরূপে ভাষান্তর করিতে পারিয়াছেন।…

আমি সময় সময় পারী সহরের বিখ্যাত প্রাচ্য-ভাষার বিদ্যালয়ে গিয়া লেখাপড়া করিতাম। সেই বিদ্যালয়ে একটি অল্পবয়স্কা ফরাসী মহিলার সহিত আলাপ হইয়াছিল। তিনি সযত্নে বাঙ্গালা ভাষা শিখিতেন। কেন শিখিতেন, জানেন? ঠাকুর মহাশয়ের গীতাঞ্জলি নামক পুস্তক কবিবরের নিজ ভাষাতে পড়িবার নিমিত্ত, আর কি!

আমি শুনিয়াছি যে ঠাকুর-মহাশয় আপন দেশে ঋষিস্বরূপ পূজনীয়। সমস্ত বাঙ্গালী জাতি তাঁহার কবিতা মুখস্থ করিয়া থাকেন।…ছেলেপিলে পর্য্যন্ত তাঁহার গীত গাহিয়া আনন্দ লাভ করে। মেয়ে-মানুষ সকল ঘরকন্না করিতে করিতে তাঁহার গীত দ্বারা শ্রম দূর করিয়া থাকেন। পুরুষেরা গঙ্গার প্রসারিত বক্ষে নৌকা চালাইয়া তাঁহারই গান জপ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে করিবেন না যে, তিনি একজন একলসেঁড়ে মুনি। তিনি লোক-সমাজের মধ্যে সর্ব্বদা চলা-ফিরা করেন। তিনি পশ্চিম দেশের সাহিত্য ও তত্ত্ব একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন…তিনি অনেকবার আমাদের দেশে পর্য্যটন করিয়াছেন।…

এই গীতাঞ্জলির ইতিহাস কোন্ যুগে বা কোন্ স্থানে স্থিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাহার ঘটনা-বৃত্তান্ত সর্ব্ব দেশের ও সকল সময়ের। ইহা কেবল মানব-হৃদয়ের ইতিহাস নয়, ইহার মধ্যে প্রকৃতির লীলা-খেলা উপস্থিত। ইহাতে দেখা যায়, কেমন করিয়া মানব জীবন আপন মিষ্ট-রসে মুগ্ধ হইয়া যায়।...এই কবিতাতে অনেক অসাধারণ গুণ আছে। ইহাতে সরলতা, মধুরতা, মৃদুতা, আমোদ, কৌতুক, অনেক ভাব ও অনেক চিন্তা, ভাবনা, প্রেম, শোভা, সৌন্দর্য্য পাইবেন। কিন্তু যেন এ কথা মনে থাকে যে, এ সকল কবিতা অনেক দূর থেকে আসিয়াছে। যে সভ্যতা ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের ফরাসী সভ্যতা নয়। এমন গান কি আমরা কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিব? ইহার ভিতর অতি প্রাচীন, অতি গুপ্ত কথা রহিয়াছে। ইহা একটি পুরাতন সাহিত্যের নিদর্শন। কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমরা এখন পর্য্যন্ত এই সাহিত্য জানি না।'

রবীন্দ্রনাথ এবার ইউরোপের মাটিতে পা দিতে না দিতেই নানা জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। প্রথমে তিনি গেলেন ইংলণ্ডে। সেখান থেকে গেলেন আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে ফিরে আসতে না আসতেই জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ভিয়েনা, প্রাগ, সুইজারল্যাণ্ড এই সব দেশ থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এলো। এই সব জায়গায় তিনি যে রকম সম্মান আর সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন, তা দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। এ রকম সম্বর্দ্ধনা কোন

দেশের কোন কবি তো পান নি, কোন সম্রাটও কখনো পেয়েছেন কি না সন্দেহ। কয়েক জায়গার সম্বর্দ্ধনার কথা তোমাদের শোনাই।

ডেন্‌মার্কের কোপেনহেগেন সহরে যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তাঁকে দেখবার জন্য রেল ষ্টেশনে অসংখ্য লোক জমা হ'য়ে গেল। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। সন্ধ্যে বেলায় বক্তৃতা শেষ ক'রে তিনি বেরিয়েছেন, এমন সময় সেখানকার অসংখ্য ছাত্র বড় বড় বাতির আলো হাতে নিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো, ছাত্রদের সঙ্গে সহরের লোকেরাও যোগ দিলে। তারপর কবিকে মাঝখানে রেখে অসংখ্য বাতির আলোর শোভাযাত্রা ক'রে ও সমস্ত পথ ডেন্‌মার্কের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে-গাইতে তাঁকে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর তাঁর বাড়ীর সামনে সে কি ভীড়! লোকের সে কি উল্লাস! রাত্রি দশটা হ'য়ে গেল, তবু তাদের উল্লাস আর জয়ধ্বনি থামতে চায় না।

নোবেল-পুরস্কার সুইডেন থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। পুরস্কার নির্ব্বাচন করবার জন্য এখানে বড় বড় পণ্ডিতদের এক সভা আছে। এই পণ্ডিত সমাজ রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের সভায় নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। এখানে বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতেরা রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন করেন। এই সভায় কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, নোবেল-পুরস্কার আজ পর্য্যন্ত অনেকেই পেয়েছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যের ভিতর দিয়ে শিল্প ও সাধনা

এ দুয়ের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ যে রকম ভাবে সৃষ্টি ক'রেছেন, তেমনটি আর কেউ পারেন নি।

সুইডেনে এক অতি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষ্যে সেখানকার ধর্ম্মমন্দির থেকে এক শোভা যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রার নেতা হোয়েছিলেন ধর্ম্মমন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহাশয় নিজে।

জার্ম্মানীর বার্লিন সহরে তাঁর বক্তৃতার বিরাট আয়োজন হয়, আর এই সময় ভারি মজার ব্যাপার ঘটে। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয় তাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—বক্তৃতা দেবার জন্য। বেলা বারোটার সময় বক্তৃতা হবে ঠিক হ'য়েছিল। কিন্তু দু'তিন ঘণ্টা আগে থেকেই লোক জমতে সুরু হ'য়ে গেল। দেখতে দেখতে সমস্ত হল ভ'রে গেল, কোনখানে তিল রাখবারও জায়গা রইলো না, এমন কি বারান্দা আর সিঁড়িতে পর্য্যন্ত লোকে ভ'রে গেল! বারোটার সময় কবি যখন এলেন, রাস্তায় তখন হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভীড় সরিয়ে দরজা অবধি নিয়ে এলেন, কিন্তু বক্তৃতার হলে আর ঢুকতে পারেন না। বক্তৃতার জায়গা উপরে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে লোক গিস্ গিস্ ক'রছে। এগোয় কার সাধ্যি! পথ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হ'ল। কিন্তু যারা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েছিল তারা পিছু হট্‌তেই পারে না—পিছনেও যে ভীড়! কর্ত্তৃপক্ষ নিরুপায় হ'য়ে পুলিশের ভয় দেখালেন। লোকেরা

এতে ভয়ানক চটে গেল। তারা এসেছে ভারতের কবিকে দেখতে আর তাঁর বক্তৃতা শুনতে—এতে তাদের অপরাধ! কিন্তু যিনি বক্তৃতা দেবেন, তিনি যে এদিকে বক্তৃতার জায়গাতেই ঢুকতে পারছেন না, সেদিকে কারো খেয়াল নেই। কর্ত্তৃপক্ষ ভয়ানক মুস্কিলে প'ড়লেন। শেষে বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন অধ্যাপক সকলকে বললেন, কবিবরকে যদি ফিরে যেতে হয়, তা হ'লে বার্লিনের লোকের লজ্জার আর সীমা থাকবে না। জায়গা কোন রকম ক'রে খালি ক'রতেই হবে। যাঁরা এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন বক্তৃতা শোনাবার জন্য, তাঁদের অবশ্য তিনি কিছুই বলছেন না, তবে তিনি নিজে আর তাঁর ছাত্রেরা বেরিয়ে যাচ্ছেন, এতে জায়গা অনেকটা খালি হ'য়ে যাবে। এই বলে তিনি বাইরে গেলেন, আর তাঁর পিছু পিছু প্রায় পাঁচ-ছ'শ ছাত্র বেরিয়ে চ'ল্‌লো। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে ছাত্রদের ব'ললেন যে, তাদের নিরাশ হ'তে হবে না। কাল তিনি আলাদা ক'রে তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ ক'রবেন।

তারপর বক্তৃতা শেষ ক'রে কবি যখন বাইরে বেরুলেন, দেখা গেল প্রায় চোদ্দ-পনরো হাজার লোক রাস্তার দু'ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাঁকে দেখবার জন্য। তিনি চ'লে যেতে লাগলেন, আর লোকেরা তাঁকে দেখে বিপুল জয়ধ্বনি আর উল্লাসে রাস্তা একেবারে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।

জার্ম্মানীর লোকেরা তাঁকে দেখবার জন্যও যেমন পাগল, তাঁর বই পড়বার জন্যও তেমনি পাগল। রবীন্দ্রনাথের "সাধনা"

বইখানির জার্ম্মান অনুবাদ ছাপা হয়। এই বই জার্ম্মানীর লোকের এত ভাল লাগে যে, তিন সপ্তাহের ভিতর এর পঞ্চাশ হাজার খানা বিক্রী হ'য়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ যেখানেই গেছলেন, সমাদরের আর অন্ত ছিল না। এবার ফ্রান্সের কথা বলি—এখানেই তিনি সব প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সের ষ্ট্রাস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন হয়। সেখানকার অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভী মহাশয় বিরাট আয়োজন করেন। বক্তৃতার দিন কবিকে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য সমস্ত সহর একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। ভারতবর্ষের অনেক ছাত্র সেখানে থাকেন। তাঁরা সবাই সেদিন কবির সঙ্গে ছিলেন। কবি নিজে কোন দিন বিদেশী পোষাক পরেন না, তা তোমরা জান। ছাত্ররাও সেদিন মাথায় পাগড়ী প'রে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন। কবিবর ধীরগম্ভীরপদে বক্তৃতা-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছিলেন, আর তাঁকে ঘিরে চ'লছিলেন পাগড়ী-পরা তাঁর স্বদেশের যুবকেরা। তখনকার সে দৃশ্যটি ভারি চমৎকার। তাঁর সেই শান্ত মহিমান্বিত মূর্ত্তি দেখে দর্শকেরা আনন্দে ঘন ঘন হাততালি দিয়ে উঠলেন।

কবিবরের পরিচয় দিতে উঠলেন স্বয়ং অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভী মহাশয়। তিনি বললেন,—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কে, তাহা আপনাদের বলিয়া আমি মূঢ়তার পরিচয় দিব না; তাঁর নাম ও তাঁর গ্রন্থাবলী

বিশ্বব্যাপী গৌরবের অর্ঘ্য লাভ করিয়াছে।...ঠাকুর মহাশয়ের যে প্রতিভা, তাহা স্বয়ং ভারতেরই প্রতিভা—যে প্রতিভা বুদ্ধদেব, ব্যাস, বাল্মীকি, অশ্বঘোষ, কালিদাস প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যাহা কালে কালে নব নব উজ্জ্বল নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহাই আজ এই কবির মূর্ত্তি ধরিয়াছে !...

আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ষ্ট্রাস্‌বুর্গ ইউনিভারসিটি কেবল যে একজন প্রতিভাবান কবিকে ও এক মহাজাতির যুগপ্রবর্ত্তক প্রতিভাকে সম্মান করিল তাহা নয়, ষ্ট্রাস্‌বুর্গের ফরাসী ইউনিভারসিটি ভারতের ভগিনী 'বিশ্বভারতী'কে সম্মান করিল।

...কবির নামের অর্থ রবির রাজার রাজা এবং তাঁর বংশগত উপাধির অর্থ দেবতা। যারা তাঁর রচনা পড়ে, যারা তাঁকে দেখে, যারা তাঁর বাণী শোনে, তারাই অনুভব করে এমন দম্ভভরা নাম কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কখনো এঁর চেয়ে সুসঙ্গত হইতে পারে না।

যিনি রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর তিনি ভারতের কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ও ভারতের জনপুঞ্জকে রক্ষা করুন।

তার পর সেই মুগ্ধ জনপুঞ্জকে কবিবর তাঁর 'তপোবনের বাণী' শোনালেন। শ্রোতারা নীরব হ'য়ে, বিনয়-নম্র হ'য়ে, তাঁর সে বাণী শুনলেন। তাঁর বাক্যের ছন্দ আর তাল, তাঁর অসাধারণ কণ্ঠস্বর সকলকে অভিভূত ক'রে ফেললে। কেউ কেউ এত বেশী মুগ্ধ হ'ল যে, প্রবন্ধ পড়া শেষ ক'রে যখন তিনি

চ'লে যেতে লাগলেন তখন তারা তাঁর লম্বা জোব্বার কিনারার ধূলো ভক্তির সহিত চুম্বন ক'রে ক'রে মুছে নিতে লাগলো। আমাদের দেশের জ্ঞান আর বিদ্যার কাছে সে দেশের নতি স্বীকারের একেবারে চরম দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ যে-দেশেই পা দিয়েছিলেন, ভক্তির চরম অর্ঘ লাভ করেছিলেন। আমেরিকার লোকে তো তাঁকে যীশুখৃষ্টের অবতার ব'লেই পূজো ক'রেছিল।

কিন্তু এই ভক্তি, এই অর্ঘ কিসের জন্য! কি তিনি তাদের দিয়েছিলেন! কি তাদের ব'লেছিলেন! তিনি তাদের দিয়েছিলেন, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী। সে বাণী পরকে আপনার করে, আর জাতির মধ্যে জাতির, মানুষের মধ্যে মানুষের ভালবাসা জন্মায়, দূরকে নিকটে আনে। তিনি তাদের কি ব'লেছিলেন শুনবে? তিনি ব'লেছিলেন,—

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খৃষ্টান।

এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।

মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে,
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

তাঁর এই ডাকে দিক্‌দিগন্তে সাড়া প'ড়ে গেছলো, তাই—

পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

বিশ্বমানবের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনা ক'রে আর তাঁর পুণ্যতীর্থ "বিশ্বভারতী"র জন্য জগতের গুণীলোকের শ্রদ্ধা, প্রীতি আর ভক্তি উপহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। তাঁর এই বিশ্বভারতীর কথা পরে তোমাদের শোনাব। কিন্তু তার আগে কবিবরের এসিয়া ভ্রমণ ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণের কথা সংক্ষেপে তোমাদের শুনিয়ে দিই।

পূর্ব্ব এসিয়ায়

ইতিহাসে তোমরা প'ড়েছ যে, অতি প্রাচীনকালে আমাদের এই ভারতবর্ষের সভ্যতা এ রকম উন্নত ছিল যে, চীন, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে আর প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপ সকলে সেই সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছিল। ঐ সকল দেশের সঙ্গে তখন আমাদের হৃদয়ের আর মনের বেশ একটি সম্বন্ধ ছিল। এতে তাদেরই যে শুধু উপকার হ'ত তা নয়, আমাদেরও উপকার হ'ত। তার পর অনেক বছর থেকে ঐ সব দেশের সঙ্গে আমাদের সকল রকম সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হ'য়ে যায়।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর চীনের পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই উপলক্ষ্যে ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন-ভ্রমণে যান। পথে তিনি রেঙ্গুন, মলয়দ্বীপ, সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপ এই সব জায়গা হ'য়ে যান। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি রাজার সম্মান পেয়েছিলেন। চীন দেশেও যে তাঁর সম্বর্দ্ধনা চূড়ান্ত হ'য়েছিল, তা আর বলতে হবে না বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,—"তাহারা তাহাদের অতিথিবাৎসল্যের আতিশয্যে আমাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। আমার সঙ্গীরা তথায় বর-যাত্রীর আদর লাভ করিয়াছেন।

আমাদের সন্তোষবিধানের জন্য, অভাব অভিযোগ দূর করিবার নিমিত্ত সৈন্যদল আমাদের সঙ্গে গিয়াছে, প্রত্যেক ষ্টেশনে ষ্টেশনে খবর লইয়াছে, যে, ভারতবাসী অতিথিদের কোন প্রকার অসুবিধা আছে কিনা—"

রবীন্দ্রনাথ যখন পিকিঙ সহরের মধ্যে প্রবেশ ক'রলেন, তখন সেখানকার শিক্ষিত অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর, সকল রকমের লোকই তাঁর অভ্যর্থনায় যোগ দিয়েছিল। চীন দেশ আমাদের কাছ থেকে সকল রকমেই এখন পৃথক্। ইংলণ্ড, আমেরিকা আজকাল আমাদের এ-পাড়া ও-পাড়ার মতো। চীনদেশ অনেক কাছে হ'লেও তাদের ভাষা ভিন্ন, চাল-চলন ভিন্ন, সকল বিষয়েই তারা আলাদা। সেখানকার লোকেরা আমাদের দেশের ভিতরকার কোন খবরই রাখে না। তবু যে তারা আমাদের কবিকে এ ভাবে অভ্যর্থনা করলো, তা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় কি?

রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে চীনের ছাত্রদের উৎসাহের আর সীমা ছিল না। পিকিঙের ছাত্ররা সেখানকার গবর্মেণ্টের কাছে আবেদন ক'রেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ এলে পর তাঁকে যেন চীন-সম্রাটের প্রাসাদের কাছে থাকতে দেওয়া হয়। ছাত্রদের এই আবেদন মঞ্জুর হ'য়েছিল। পিকিঙের প্রায় পাঁচ হাজার চীনা-ছাত্র একত্র হ'য়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে। রবীন্দ্রনাথ এই অভ্যর্থনা-সভায় এসিয়ার প্রাচীন সভ্যতা আর চীন ও ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

চীনের ভূতপূর্ব্বক সম্রাট্ হুয়ান্ তাং রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। সম্রাট্ প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটি ছবি উপহার দেন। ছবিখানি প্রায় চারশ' বছরের পুরাতন।

রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে গেছলেন, মৈত্রীর ভাব স্থাপন করতে। তিনি বলেছেন—

"ভারতের ক্ষতি-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা প্রচারকল্পে আমি তথায় যাই নাই—গিয়েছিলাম, শুধু সহজ মানুষের মতন—মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই সম্বন্ধের দোহাই দিয়েই গিয়েছিলাম।······মানুষের অন্তরতম গভীরতা বুঝতে গেলে, নত হোয়ে, নম্র হোয়ে, সাধক হোয়ে যেতে হবে, উঁচু মাথায় যাওয়া চলে না।······আমি তাই নত হোয়ে গিয়েছিলাম। মানুষের কাছে মানুষ হোয়ে গিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম,······ভাই, আমি সামান্য কবি মাত্র, আমি তোমাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই, মাথার উপরে উঠতে চাই না।······আমি জানি, উচ্চ নীচে কখন প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। তাই, তাদের মধ্যে সমান হোয়ে মিলতে গিয়েছিলাম।"

চীনদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন প'ড়েছিল। চীনারা তাঁকে নববস্ত্র আর অনেক রকম উপঢৌকন দিয়েছিলেন। নীল পায়জামা, কমলা লেবুর রঙের আলখাল্লা আর বেগুনে রঙের টুপি—এই সব তাঁকে প'রতে দেওয়া হয়। তিনি এইগুলি প'রে

সকলকে দেখান, আর প্রার্থনা করেন যেন সূর্য্যের মতো প্রতিদিন নূতন জীবন লাভ ক'রে নূতন নূতন ভাবে সকলকে তিনি উদ্বুদ্ধ ক'রতে পারেন। চীনারা তাঁর নাম করণ করেন, চু—চেন্—তাং ; এর অর্থ—বজ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ভারত-সূর্য্য। এই নামটি চীনা অক্ষরে এই রকম :—
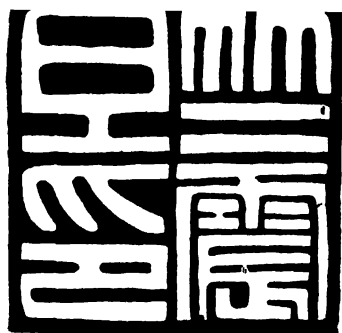
চু—চেন্—তাং

চীন দেশ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ জাপানেও গেছলেন। জাপানের লোকেরা তাঁর বক্তৃতা শুনে ব'লেছিল—আমরা ভারতবর্ষেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে সত্য লাভ ক'রবো। অন্য দেশের কা'ছে যা পাব, তাতে বারে বারে মুগ্ধ হবো, আর বারে বারে ভুল ক'রবো।

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ভক্তির অর্ঘ এনেছিলেন, চীন-জাপান ভ্রমণ ক'রেও সেই অর্ঘ নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন।

কিন্তু এইখানেই তাঁর ভ্রমণের কথা শেষ হ'ল না। বছর দুইয়ের মধ্যে আবার তাঁকে ইউরোপ ভ্রমণে বেরুতে হ'ল। পশ্চিম দেশ রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু যে শান্তির বাণীই শুনেছিল তা নয়, মুক্তির বাণীও শুনেছিল। পশ্চিমের লোকেরা ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য্য নিয়েই উন্মত্ত। তারা শুধু জড়-বিজ্ঞানেরই খবর রাখে, মুক্তির সন্ধান তারা পাবে কোথায়? রবীন্দ্রনাথের কাছে এর অল্প একটু শুনেই তারা ধন্য হ'য়ে গেছলো।

এবার নিমন্ত্রিত হ'য়ে তিনি সব প্রথমে গেলেন ইটালীতে। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা তাঁকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে রোমে নিয়ে গেলেন। ইটালীর তখনকার হর্ত্তাকর্ত্তা মুসোলিনীকে তোমরা চেনো নিশ্চয়। মুসোলিনী তাঁকে সাদর নমস্কার জানিয়ে বলেন, "আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠক। ইতালীয় ভাষায় আপনার যে-কোন বই বা'র হ'লে, আমি তা আগ্রহের সহিত পাঠ করি।" তিনি সেখানে রাজসরকারের অতিথি হ'লেন। সে এক মহা সমারোহ ব্যাপার। তাঁর জন্য যে সকল বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা হ'য়েছিল, আর কোন ভারতীয়ের জন্য এর আগে তা হয় নি। এখানে তিনি যে ধরণের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, তা যে-কোন দেশের সম্রাটের পক্ষেও দুর্লভ।

ইটালী থেকে তিনি যান সুইজারল্যাণ্ডে। তারপর ইংলণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেন্‌মার্ক, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে ভ্রমণ করেন। যে দেশেই তিনি পা দিয়েছিলেন, তাঁর চারিদিকে এসে জড়ো

হ'য়েছিলেন, সে দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ। সকলের কাছেই তিনি পূজা পেয়েছিলেন, তাঁর বাণী শুনে সকলেই মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

মানুষের শক্তির চরম বিকাশ দেখতে হ'লে ইউরোপের দিকেই তাকাতে হয়। ইউরোপীয় প্রভাব এখন পৃথিবী ছেয়ে গেছে। কিন্তু ইউরোপ নিজে চায় আরো বড় আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মুখে এমন এক বাণী তারা শুনেছিল, যা তাদের জড়-বিজ্ঞানের আদর্শের কাছে সম্পূর্ণ নূতন—আর যা কেবল ভারতবর্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। শক্তিশালী ইউরোপের কাছে ভারতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাই তিনি দেখিয়েছিলেন। নিজেদের দৈন্য প্রকাশ ক'রে দেশকে কোন রকম তিনি খাটো করেন নি।

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে কিছুদিন বিশ্রাম করতে না ক'রতেই আবার তাঁর নিমন্ত্রণ এলো। এবার নিমন্ত্রণ এলো ভারতদ্বীপপুঞ্জ থেকে। চীনে যাওয়ার পথে পূর্ব্বে তিনি জাভা, বালীদ্বীপ, মালয় এই সব জায়গা হ'য়ে গেছলেন, কিন্তু এবারে নিমন্ত্রণ এলো বিশেষভাবে এই সব দেশ দেখবার জন্য।

প্রথমেই ব'লেছি, এককালে ভারতবর্ষের সভ্যতা এ-রকম উন্নত ছিল যে, নানা দেশে তার প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছিল। সে আজ প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার কথা। তখন আমাদের এই ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব ছিল। হিন্দুরা তখন ভারতবর্ষের বাইরে দিগ্বিজয় ক'রে বেড়াতেন। কিন্তু তাঁদের দিগ্বিজয়ের ধারা ছিল অন্য রকমের। তরোয়াল-বন্দুক নিয়ে বা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে

তাঁরা দিগ্বিজয়ে বেরুতেন না। তাঁদের নিজেদের তৈরী জাহাজ ছিল। সেই জাহাজে চ'ড়ে তাঁরা নিজেদেরই শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান সমুদ্র-পারেও প্রচার ক'রে বেড়াতেন। হিন্দুরা যখন রাজা ছিলেন—তাঁদের যখন নিজেদের রাজত্ব ছিল, তখন তাঁদের শিক্ষা-সভ্যতাও ছিল পৃথিবীর অন্য সব জাতির চেয়ে ঢের বেশী উন্নত। হিন্দুরা জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে বিদেশে গিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে মিশতেন হৃদয় দিয়ে, আর অতি সহজেই তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন। এই ভাবে তাঁরা জাভা, বালী, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দ্বীপেও গেছলেন। হিন্দুদের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন এখনো এই সকল দ্বীপে বর্ত্তমান র'য়েছে। এই সব কীর্ত্তি দেখবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ সেখানকার লোকদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে তিনি জাভা যাত্রা করলেন। যাওয়ার পথে প্রথমে তিনি গেলেন সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে যান মালয় দ্বীপে। মালয়ের লোকেরা মহাসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। তিনি সেখানে নানা জায়গায় বক্তৃতা দেন। তার পর সেখান থেকে বলীদ্বীপে গিয়ে পৌঁছেন। বলীদ্বীপে পৌঁছে সে জায়গার যে বর্ণনাটি তিনি দিয়েছেন, তা ভারি সুন্দর। তিনি ব'লেছেন,—

> ···দেখলেম ধরণীর চির-যৌবনা মূর্ত্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হ'য়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ।···

…এই বালীদ্বীপে বর্ত্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হ'য়ে আছে। এখানে কাল সংক্ষেপ করবার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন এ কালের, তেমনি সে কালের। ঋতুগুলি যেমন চলেচে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেমনি চলেচে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন ক'রে।…

বালীতে তিনি এক রাজার বাড়ীতে অতিথি হন। রাজা তাঁকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। অভ্যর্থনার ঘটা কি রকম ছিল, তা তাঁর নিজের কথাতেই শোন—

রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো। এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ—একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি; মাথায় মস্ত উঁচু কারু-খচিত টুপি, টুপির উপরিভাগে কাঁচের তৈরী এক একটা চূড়া। এঁরা চারজন পাশাপাশি ব'সে আপন আপন দেবতার স্তব-মন্ত্র প'ড়ে যাচ্চেন। একজন প্রাচীনা এবং একজন বালিকা অর্ঘ্যের থালি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে। সবসুদ্ধ সাজ-সজ্জা খুব বিচিত্র ও সমারোহ-বিশিষ্ট। পরে শোনা গেল, এই মাঙ্গল্য মন্ত্রপাঠ চল্‌ছিল রাজবাড়ীতে আমারি আগমন উপলক্ষ্যে। রাজা বল্‌লেন, আমার আগমনের পুণ্যে প্রজাদের মঙ্গল হবে, ভূমি সফলা হবে এই কামনায় স্তব-মন্ত্রের আবৃত্তি। রাজা বিষ্ণুবংশীয় ব'লে নিজের পরিচয় দিলেন।

এদেশের লোকের এ রকম খাঁটি হিন্দুভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযাত্রিগণ বিস্মিত হ'লেন। তাঁরা দেখলেন যে, এখানে মন্দিরে মন্দিরে, যেমন বরবুদুর মন্দিরে, হিন্দুসভ্যতার বিরাট চিহ্ন নানাভাবে আঁকা র'য়েছে। দেখে তাঁরা মুগ্ধ হ'লেন। দেখলেন যে, এখনো বিস্তর হিন্দু এখানে বসবাস ক'রছে। এদের ক্রিয়া-কর্ম্ম, আচার-নিয়ম সবই হিন্দুর মতো। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীগুলি এ দেশের লোকের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে র'য়েছে। পৌরাণিক যাত্রার অভিনয় এখানকার লোকের অত্যন্ত আদরের জিনিষ। এদের নৃত্যকলা এ রকম নিখুঁত ও সুন্দর যে, সে রকম আর কোথাও নেই, আর এর উপর বিদেশী সভ্যতার ছাপ এখনো এসে পড়ে নি ব'লে আরো বেশী মনোরম।

বালীদ্বীপ থেকে রবীন্দ্রনাথ জাভায় গেলেন। সেখানেও দেখলেন, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার অনেক চিহ্ন এখনো পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। জাভা থেকে ফিরবার পথে তিনি শ্যাম দেশে গেলেন। শ্যামের রাজা বৌদ্ধ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ ক'রলেন। শ্যামের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে, তাঁর বিশ্বভারতীর আদর্শের কথা শুনে খুবই মোহিত হ'লেন, আর প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বিশ্বভারতীর জন্য বৌদ্ধ-শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক তাঁরা নিযুক্ত ক'রবেন।

এইভাবে দ্বীপময় ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন ক'রে আর নানা জাতির লোকের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ক'রে

রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন। আর এবারেও তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন ঐ-সব দেশ থেকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ—যা তিনি এনেছিলেন চীন ও জাপান থেকে, যা তিনি প্রতিবারেই নিয়ে এসেছিলেন আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থান থেকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ ভারতবর্ষেরও নানাস্থানে গেছলেন, নানা উপলক্ষ্যে বহুবার নিমন্ত্রিত হ'য়ে। যেমন,—বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে, গুজরাট, বরোদা, ভরতপুর ও উত্তর ভারতের বহু বহু স্থানে। সিংহলেও তিনি গেছলেন। সব জায়গাতেই তিনি দেবতার মতো পূজা পেয়েছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তাঁর বিদেশ ভ্রমণ এখনো শেষ হ'য়ে যায়নি। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়ায় যান নিমন্ত্রিত হ'য়ে। রাশিয়ার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলেছিল বহু আগে থেকেই। মস্কোতে তাঁকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। সে দেশের বহু গুণী লোক বলতে লাগলেন যে, তাঁর মতো মনীষীর রাশিয়ায় পদার্পণ সে দেশের পক্ষে এক মহা স্মরণীয় ঘটনা। এই রকম করে সারা পৃথিবী তিনি ভ্রমণ করেছিলেন দু'একবার নয়, বারো বার।

তাঁর শেষবারের ভ্রমণটি কিছু নূতন রকমের। কবির বয়স তখন একাত্তর বছর। নিমন্ত্রণ এলো পারস্য থেকে, নিমন্ত্রণ এলো ইরাক থেকে। পারস্য দেশের যাওয়ার পথ মোটেই সুগম নয়। অথচ যেতেই হবে তাঁকে। স্থির হ'ল, এবার
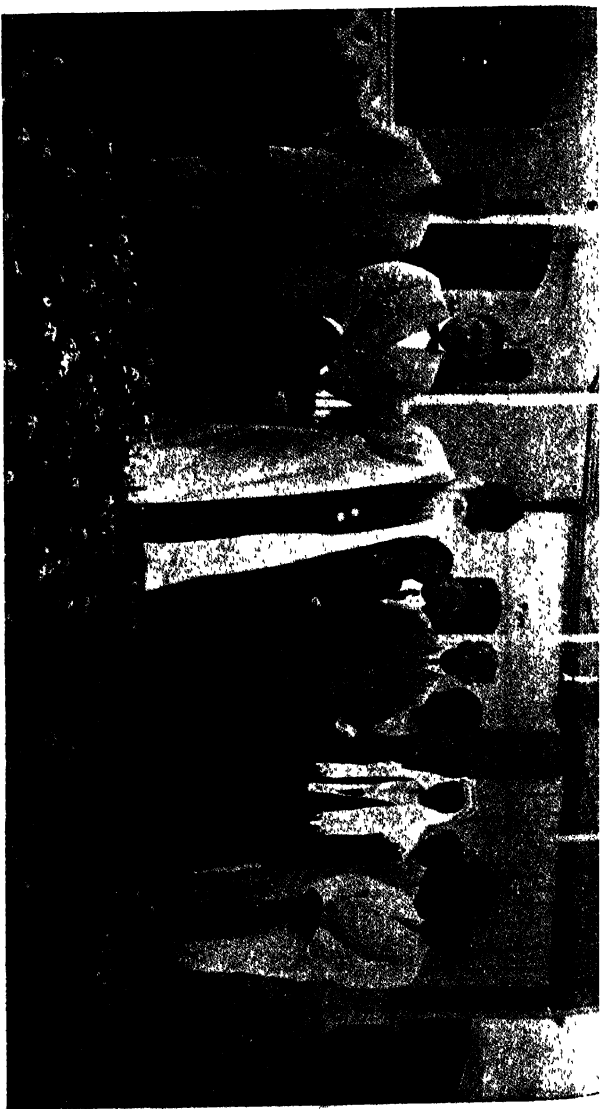
বোগ্‌দাদে রবীন্দ্রনাথ

জাফর পাশা, কবি ও রাজা ফৈজল

তিনি বিমানে চ'ড়ে যাবেন। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে আকাশ পথে তিনি পারস্যে গিয়ে পৌঁছলেন। পারস্য হ'ল কবির দেশ—কবি সাদি ও হাফেজের জন্ম স্থান। এঁদের সমাধিস্থান দেখে আর পারস্যের নানাস্থান ঘুরে কবি যখন রাজধানী তেহারাণে পৌঁছলেন, পারস্যের রাজা রেজা সা' পল্লভী মহাসমারোহে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রলেন। রেজা সা'র আদেশে সেখানে কবির জন্মতিথি উৎসব হ'ল, খুব জাকজমক ক'রে। বেদুঈনরা পর্য্যন্ত ছুটে এলো তাঁকে দেখবার জন্য ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। পারস্য থেকে ফিরবারপথে তিনি বোগ্‌দাদে গেলেন। এখানেও তাঁর অভ্যর্থনার প্রচুর আয়োজন ছিল। বোগ্‌দাদের রাজা ফৈজল বিপুল আদরে কবিকে সম্বর্দ্ধনা ক'রলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখনই যে দেশে গেছলেন, রাজারও অধিক সম্মান পেয়েছিলেন। জনসাধারণের তো কথাই নেই, সে সব দেশের যাঁরা হর্ত্তা-কর্ত্তা, যাঁরা সেরা পণ্ডিত ও জ্ঞানী, তাঁরাও ভারতের কবিকে পরম সমাদরে গ্রহণ ক'রেছিলেন। যেমন,—জার্ম্মানীর রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবার্গ, কাউণ্ট কাইসরলিং, মহামনীষী রমাঁ্যা রোলাঁ্যা, এলবার্ট আইনষ্টীন্, বার্ণার্ড শ, ফ্রয়েড এবং এই রকম আরো আরো। এঁরা সবাই ভারতের কবিকে সম্মান দিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে, আলাপ ক'রে, কৃতার্থ হ'য়েছিলেন ও বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রেছিলেন। ভারতের সংস্কৃতি ও বিশ্ব সভ্যতার জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তাই তিনি

নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা উপলক্ষ্যে আর সম্মান পেয়েছেন, পূজা পেয়েছেন সর্ব্বত্র। তিনি ব'লতেন, —ভারত কখনো মরে না। ভারতের সাধনা অমর। নূতন নূতন ভাব নিয়ে সে বেঁচে ওঠে—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।

তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনাব
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

তাঁর এই বাণী নিজেই তিনি সার্থক ক'রে গেছেন, তাঁর জীবনে

শিশু জগৎ

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও গুণের কথা, তাঁর জগৎ-জোড়া সম্মানের কথা কিছু কিছু তোমরা শুনলে। তোমরা হয়তো ভাবছো, যিনি অতবড় একজন মনীষী, সারা জগতের জন্য বড় বড় বিষয় নিয়ে যিনি ভাবেন, না-জানি তিনি ছিলেন কতই বেশী গুরুগম্ভীর! আর গুরুগম্ভীর লোকের কাছে ছেলে-মেয়েরা তো আর ঘেঁষতে পারে না! কিন্তু এ রকম ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তাঁর সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তিখানি সর্ব্বদাই ছিল শান্তিপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ। তাঁর কাছে গেলে ছোট ছেলে মেয়েদেরও মন ভ'রে উঠতো মহাউল্লাসে।

ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি ;
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।

এই সুন্দর কথাগুলি তাঁরই অন্তরের কথা। ছোটদের তিনি আনন্দ দিয়েছেন তাদেরই মতো হ'য়ে। তিনি সারা জগতের কবি হ'লেও, ছোটদের এত বেশী আপনার ছিলেন যে, সে রকম আর একজনও খুঁজে পাবে না। তোমরা সবাই তাঁর কত যে আদরের, সে কি আর বলবো! তোমাদের কথা বলবার জন্য, তোমাদেরই প্রাণের কথাগুলি বোঝাবার জন্য তাঁর কতই না আগ্রহ!

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।
তার রবি শশী তারা
জানিনে কেমন ধারা
সভা করে আকাশের তলে,
আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে!
... ...

এতই তাঁর দরদ যে, তোমাদের কথা ভাবতে ভাবতে প্রাণটি তাঁর ঠিক হ'য়ে উঠতো তোমাদের মায়ের প্রাণের মতোই কোমল। কি রকম শুনবে?

... ...

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্য কালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস্ আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি'!
... ...

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি'—
বুঝি তা' চুমিলে তোর বদনখানি !

... ...

যে সময় তোমরা জন্ম নিয়েছ, সেই সময় তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যে আশীষ তিনি দিয়েছেন, সে রকম প্রাণ-মাতানো আশীষ-বাণী সারা বিশ্ব খুঁজেও তোমরা পেতে পার না।

আশীষ আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে ?
ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে,
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশীষ আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে !

এই যে খোকা তরুণ-তনু
নতুন মেলে আঁখি—
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা' কি ?

হিরণ্ময় কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা,
তপন শশী তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি'
এই যে খোকা তরুণ-তনু
নতুন মেলে আঁখি!

তার পর যেমন তোমরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়েছ, তিনিও র'য়েছেন নানাভাবে তোমাদের সঙ্গে। কখনো মায়ের কথায় বল্‌ছেন—

... ...

আমার খোকা সকল কথা জানে!
কিন্তু তার এমন ভাষা,
কে বুঝে তার মানে!
মৌন থাকে সাধে?

মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কি আকুলতা!
তাকায় তাই বোবার মত
মায়ের মুখচাঁদে!

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের পরে
ভিখারীটির মত!
এমন দশা সাধে?

দীনের মত করিয়া ভাণ
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ
তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে !

... ...

আবার কখনো বা খোকার মুখ দিয়ে বল্‌ছেন,—

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি,
ভোরের বেলা মাগো ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি !
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিন্‌তে আমায় পারো ?
তুমি ডাক "খোকা কোথায় ওরে !"
আমি শুধু হাসি চুপ্‌টি করে !

সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে
তখন ফুলের খেলা খেলে
টুপ্‌ করিয়ে পড়্‌ব ভুঁয়ে ঝরে !
আবার আমি তোমার খোকা হব,
"গল্প বল" তোমায় গিয়ে কব !
তুমি বল্‌বে "দুষ্টু ছিলি কোথা !"
আমি বল্‌ব "বল্‌ব না সে কথা !"

খোকার ও মায়ের মধ্যে এই যে অপূর্ব্ব ভাবটি তিনি সৃষ্টি ক'রে দিয়েছেন, তা চিরকালের। এই অপরূপ ভাবের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার মায়েদের বুকে, কোলে, চোখের পাতায় চিরন্তন ভাবে মিশে র'য়েছেন শিশু হ'য়ে। তাই তাঁর খোকা তার মায়ের কাছ থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময়ও ব'ল্‌ছে,—

তবে আমি যাই গো তবে যাই!
ভোরেরবেলা শূন্যকোলে
ডাক্‌বি যখন খোকা বলে
বল্‌ব আমি—নাই সে খোকা নাই!
মাগো যাই!

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা তোর বুকে বয়ে
ধরতে আমায় পারবিনে ত হাতে,
জলের মধ্যে হব মা ঢেউ
জান্‌তে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।

খোকার লাগি তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হয়ে বল্‌ব তোমায় "ঘুমো।"

তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুক্‌ব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো!

... ...

এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ কি, তিনি তোমাদের 'কতখানি ছিলেন? তিনি তোমাদের দেখতেন ঠিক তোমাদেরই মন নিয়ে। আর সেই জন্য তিনি ছিলেন চিরদিনই তোমাদের সমবয়সী। নিজেই তিনি কি বলেছেন শোন,—

...বিধাতার নিজের হাতের তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়, তাই চিরদিনই তা'রা ছোটদের সমবয়সী হ'য়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হ'য়ে গেছে, তা'রা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার চেয়ে বয়সে বড় হ'য়ে ওঠে, তা'রা হিমালয়ের চেয়ে বড় বয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য্য চন্দ্র তারার ন্যায় চিরদিনই কাঁচাবয়সী—হিমালয়ের মতই তারা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষীর ঝরণাধারা কোন দিনই তা'দের শুকোয় না...

এই কথাগুলি তিনি ব'লেছিলেন একখানি চিঠিতে, আর এই চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন ছোট একটি মেয়েকে। এই মেয়েটি তাঁকে প্রায়ই চিঠি লিখতো তিনিও আদর করে তার চিঠির জবাব দিতেন। শুধু জবাব দেওয়া নয়, চিঠির ভিতর দিয়েই এ রকম আলাপ জমিয়ে তুলতেন, ঠিক যেন

সামনা-সামনি বসে দুজনের কথাবার্ত্তা হচ্ছে। তাঁর এই চিঠির আলাপ এমন সুন্দর যে, কি আর বলবো? তোমরা যদি পড় তো মনে হবে, তোমাদের সঙ্গেই তিনি কথা কইছেন। সত্যি কি না দেখ। খান কয়েক চিঠি তুলে দিই—

(১)

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোট ছিলুম—তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখতুম।...আজ আর চিঠি লেখ্‌বার সময় পাই নে।...তার পরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হয়ে গেছি। যত বেশী কাজ করতে হচ্ছে, ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্ছে।... একদিন হয়ত তোমাদের সহরে যাব। তুমি লিখেছ আমাকে গাড়ীতে ক'রে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি, আমাকে দেখ্‌তে নারদমুনির মত—মস্ত বড় পাকা দাড়ি। ভয় কোরো না, আমি তার মত ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোট মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভাল মানুষটির মতো থাকবার আমি খুব চেষ্টা করব।...

(২)

তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিত্‌তে পারব না এ আমি আগে থাক্‌তে ব'লে রাখচি। তোমার মত বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না।...তারপরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব—চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম অহঙ্কার বজায় থাকবে না। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁক্‌তে বসা আমার পক্ষে চলবে না—অক্ষরের পেটের নীচে

খণ্ড ত জুড়েও সুবিধে করতে পারলুম না—যেটা এই রকম বিশ্রী দেখতে হল। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি; সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হ'ল—এবারকার মতো তোমার হাঁসেরই জিৎ রইল। এই তো গেল ছবি, তারপরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্ছে। শেষকালে তুমি রাগ ক'রে আর কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে—কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

(৩)

....

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'ল কি ক'রে জিজ্ঞাসা করেচ। বোধ হয় তার কারণ এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ ক'রে শুনি, একটিও জবাব দিই নে। আমি এত বেশী শান্ত হ'য়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ ব'লে গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাখীর অধম বলেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক্ ওদের সঙ্গে আমার চিঠি পত্র চলে না—যদি চল্‌ত তা হলে আমাকেই হার মানতে হ'ত—কেননা ওদের ডানা-ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

... ...

(৪)

তুমি ভাবচ মজা কেবল তোমাদেরই হয়েচে, তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েচ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারচ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশী ক'রেই হয়। আচ্ছা তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল? পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক ত হয়েইছিল। তুমি লিখেচ একটি ছোট মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার ক'রে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল—আমাদের এখানকার মাঠে যা চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল? ছোট ছেলের কান্না, বড়দের হাঁকডাক, ডুগ্‌ডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ্‌কোঁচ, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়ী বাজির সোঁ সোঁ, পটকার ফুট্‌ফাট্, পুলিশ চৌকীদারের হৈ হৈ, হাসি, কান্না, গান, চেঁচা-মেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড় হাট বসেছিল, তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ বিক্রি হ'ল। এক এক পয়সা দিয়ে ছেলে-মেয়েরা সব নাগর-দোলায় দুলুল; চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তারপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন—তাতে সিঙাড়া আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন—এক-একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রি করেছিলেন—এক-একটা আলুর-দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হ'ল। সুকেশী বৌমা চিনেবাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার

এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হ'য়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল—তার খড়ের চাল, চারিদিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে—সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর ক'রে তিন টাকায় বিক্রি করেচে। ভেবে দেখ কি রকম ভয়ানক মজা! ছোট মেয়েরা এক টুক্‌রো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারিদিকে পাড় সেলাই ক'রে আমার কাছে এনে বল্লে, "এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে"—ব'লে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে—এমন ভয়ানক মজা!...নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধূমধাম গোলমাল···আট আনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয় নি—অতএব আমারই জিৎ রইল।

এই ধরণের কত চিঠি যে আরো কত ছেলেমেয়েদের তিনি লিখেছেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি যেন ছিলেন ছোট ছেলেমেয়েদেরই একজন। এদের জন্য লিখতে হোলে মন তাঁর কি-রকম আনন্দেই যে নেচে উঠতো! একজনকে লিখতে বসে তিনি ব'লেছেন,—

লিখ্‌তে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচ্‌বে আজও আমার হাতে।
সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,
সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।

খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলা-ঘরে ;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথ হারানো তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথ-পাতা
সেই কলমে আপ্‌নি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে॥

এই আশ্চর্য মানুষটিকে অনেকেই তোমরা দেখনি নিশ্চয়। কিন্তু তোমাদের মতো অসংখ্য ছেলেমেয়ে শান্তিনিকেতনে এঁকে দিনরাত ঘিরে থাকতো। আর এদের সকলকে নিয়ে সেখানে এমন এক অপূর্ব্ব জগৎ গ'ড়ে উঠেছিল, যা আর কোন দেশে মেলে না।

তাঁর শান্তিনিকেতনের কথা নিশ্চয় তোমরা শুনেছ। শান্তিনিকেতন এখন বিশ্বভারতীর রূপ ধ'রে বিশ্বমানবের সঙ্গে যোগস্থাপন ক'রে বসেছে। কিন্তু এর সব-গোড়াতে ছিল তোমাদেরই মতো ছোট-বড় নানা বয়সী শিশুর মেলা আর তাদেরই রঙ্গলীলা; আর এ সকলের মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে।

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগরতীরে।

তাঁর এই পুণ্যতীর্থ শান্তিনিকেতনের কথা এবার তোমাদের বলবো। শান্তিনিকেতনের কথা ব'লতে গেলে আবার গোড়ায় ফিরে যেতে হয়। শান্তিনিকেতন এখন বিশ্বভারতীর রূপ নিয়েছে আর এখানে বিশ্বের মেলা ব'সে গেছে। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান ও অন্য সকল জাতের লোক মিলে এটিকে এখন তীর্থস্থান ক'রে তুলেছে। কিন্তু গোড়াতে এটি ছিল একটি জনশূন্য মাঠ। কি ক'রে এই জনশূন্য মাঠে বিশ্বের মেলা ব'সে গেল, তা বড়ই অপূর্ব্ব।

এই শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মহর্ষি একদিন বোলপুর ষ্টেশন থেকে এই মাঠ দিয়ে রায়পুরে যাচ্ছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে। এই মাঠের উপর তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি ছাতিম গাছ ছাড়া আর কোন গাছই ছিল না। তিনি অল্পক্ষণের জন্য ছাতিমের ছায়ায় দাঁড়ালেন। বিস্তীর্ণ মাঠ। চারদিক ধূ-ধূ ক'রছে। বাড়ীঘর

নেই, গাছপালা দূরের কথা, সবুজ রঙের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। খালি ঐ দুটি ছাতিম গাছ মাথাউঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে নীল আকাশ, নীচে প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। যত দূর দৃষ্টি যায়, এ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। এই নির্জ্জন স্থানটি মহর্ষির বড়ই ভাল লাগলো—এই ছাতিমের ছায়াটি সাধনার উপযুক্ত স্থান ব'লে তাঁর মনে হ'ল। এর পর থেকে মাঝে মাঝে এই জায়গায় তাঁর তাঁবু পড়তে সুরু হ'ল। এই জায়গার নাম ছিল ভুবনডাঙ্গা। কাছেই ছিল একদল ডাকাতের আড্ডা। তারা এখানে ডাকাতি করতো। বোলপুর থেকে চারদিকের গ্রামে যাবার এই হ'ল পথ। পথের মাঝে এই মাঠ। মাঠে লোকজন নেই, কাজেই ডাকাতির পক্ষে এমন সুবিধামত জায়গা আর হয় না। কত লোককে যে ডাকাতেরা খুন ক'রে ঐ ছাতিমগাছের তলায় পুঁতে রেখেছিল তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু ঐ ছাতিম-তলাই হ'য়ে দাঁড়ালো মহর্ষির নির্জ্জন সাধনার স্থান। তারপর ডাকাতের সর্দ্দার ধরা দিল। ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সে মহর্ষির সেবায় লেগে গেল। যেটা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা, সেইটা হ'য়ে দাঁড়ালো আশ্রয়ের স্থান—আশ্রম।

মহর্ষি এই জায়গার নাম দিলেন শান্তিনিকেতন। তার পর তিনি এখানে আশ্রম রচনা করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। অন্য জায়গা থেকে মাটি আনিয়ে সেই মাটি শান্তিনিকেতনে ফেলে তিনি এক সুন্দর বাগান তৈরী করলেন। গোলাপ, যুঁই, বকুল,

বেল, মাধবী, মালতী, গন্ধরাজ এই সব ফুলের গাছ—আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা এই সব ফলের গাছ এই বাগানে দেওয়া হ'ল। যেটা ছিল মরুভূমি, সেখানে শাল, মহুয়া, দেবদারু এই সব বড় বড় গাছও দেখতে দেখতে বেড়ে উঠতে লাগলো। ফুল ফুটলো, সৌরভ ছুটলো, ছায়া নামলো। পাখীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে উৎসব জমিয়ে তুললো। শান্তিনিকেতন সকলের পক্ষেই শান্তির নিকেতন হ'য়ে উঠলো। ফলে, ফুলে, গাছেভরা এখনকার শান্তিনিকেতন দেখলে তখনকার জনশূন্য মাঠের কল্পনা করা শক্ত হ'য়ে ওঠে। সেই ছাতিমগাছ দুটি এখনো আছে। ছাতিম তলায় মার্ব্বেলের বেদীটি মহর্ষির নির্জ্জন সাধনার জায়গাটির এখনো সাক্ষী দিচ্ছে। এই বেদীতে লেখা আছে—

তিনি
আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।

মহর্ষি এই জায়গায় দিনের পর দিন,মাসের পর মাস ঈশ্বরের উপাসনা ক'রে কাটিয়েছেন। তিনি এখানে যে সাধনার বীজ বপন ক'রেছিলেন, তার ফলে শান্তিনিকেতনের প্রান্তর আজ পুণ্যতীর্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক টাকা খরচ করে তিনি এখানে একটি মন্দির তৈরী করান। মন্দিরটির মেঝে মার্ব্বেলের তৈরী। নানা রকম

রঙিন কাচের দেওয়াল। দেওয়ালে অনেকগুলি দরজা। দরজাগুলি মেলে দিলেই চারিদিক একেবারে খোলা। ধর্ম্ম-উপাসনার জন্যই এত আয়োজন ক'রে এসব তৈরী হয়। আশ্রমে যাঁর ইচ্ছে এসে সাধনা ক'রবেন, থাকবেন, তারই ব্যবস্থা হয়। সাধনা আর উপাসনা ছাড়া আশ্রমে একটি গ্রন্থাগার আর বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে এ ইচ্ছাও তাঁর ছিল। মহর্ষির এই ইচ্ছা পূর্ণ ক'রলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৩০৮ সালের পৌষ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কবি নিজেই পড়াতেন ছাত্রছাত্রীদের আর নিজেই সব দেখাশুনা ক'রতেন। এই সময় কবি এদের খেলারও সঙ্গী ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার ভার ছিল কবি-পত্নীর উপর। তিনি নিজের হাতে রেঁধে দিনের পর দিন সকলকে খাইয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করেন। প্রথম প্রথম বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল কয়েকটি মাত্র। ক্রমশঃ তার সংখ্যা বেড়ে চললো। তারপর দশ পনেরো বছরের ভিতর দেশ বিদেশ থেকে শত শত ছাত্র এসে ভর্ত্তি হ'ল। শান্তিনিকেতনের মাঠ বিদ্যালয়ের কুটীরে কুটীরে ছেয়ে গেল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মহর্ষি একদিন ব'লেছিলেন—আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত মাঠ ছেলেতে ছেলেতে ভ'রে গেছে। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কেউ কোন রকম নিরাশার ভাব দেখালে তিনি বলতেন—তোমরা কিছু ভেবো না, ওখানকার জন্য কোন

ভয় নেই;—আমি ওখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতংকে প্রতিষ্ঠা ক'রে এসেছি।

শান্তিনিকেতনের এই বিদ্যালয়টি ভারি মজার। স্কুল ব'ললে আগেই তোমাদের মনে প'ড়ে যায় মাষ্টার-পণ্ডিতের বকুনি,' আর মার-ধোর। স্কুলে যাবার নাম হ'লেই মনটি তোমাদের দমে যায়। এখানকার স্কুল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের—বকুনি বা মারধোরের নাম-গন্ধও এখানে নেই। ছেলেরা এখানে খেলা-ধুলো, গল্প, গান, অর্থাৎ আনন্দের ভিতর দিয়ে লেখা পড়া শেখে। এখানে তারা খোলা মাঠে ছুটোপাটি ক'রে বেড়ায়। গাছের ছায়ায় ব'সে লেখা পড়া করে। শিক্ষকমশায়দের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পায়। এখানে তাদের বড়ই আনন্দ।

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন॥
তার আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥

মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীলগগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।

মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন॥

... ...

কবির শেখানো এই গানটিতে র'য়েছে তাদেরই প্রাণের কথা।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ঋষিদের আশ্রম যে ভাবের ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অনেকটা সেই আদর্শে গঠিত করেন। এখানে ছাত্রদের থাকবার, লেখা পড়া করবার ধরন-ধারণ ও ব্যবস্থা গোড়াতে ছিল একেবারেই আলাদা রকমের। তার কিছু কিছু বলি।

খুব ভোরে ছোট বড় সকল ছেলেকেই ঘুম থেকে উঠতে হ'ত। ছেলেরা মুখ-হাত পরিষ্কার ক'রে শোবার ঘর নিজে নিজেই সাফ ক'রতো। তারপর খোলা জায়গায় ব্যায়াম। ব্যায়ামের পর স্নান। স্নানের পর ধ্যান-ধারণা ও উপাসনা। সকল ছেলেকেই একা একা ব'সে ধ্যান ক'রতে হ'ত অন্ততঃ পনর মিনিট। ধ্যানের পর সকল ছেলেকে এক জায়গায় জড়ো হ'য়ে উপাসনা ক'রতে হ'ত। উপাসনার মন্ত্রগুলি বেদ থেকে নির্ব্বাচন করা। ছাত্রদের জুতা ছাতা ব্যবহার করবার তখন নিয়ম ছিল না। আহার ছিল নিরামিষ। অনেক কাজ তাদের নিজেদের হাতে ক'রতে হ'ত। এই সব নিয়ম বহুকাল ছিল। তারপর "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে এই সব নিয়মের অদল বদল হ'য়েছে। বিশ্বভারতীর উদ্বোধন হয় ১৩২৫ সালের ৮ই পৌষ। গোড়ার সেই ছোট-খাট বিদ্যালয়টি ক্রমে বিশ্বভারতীর রূপ ধ'রে এখন এক বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'য়েছে। এখানে এখন নানা বিভাগ গ'ড়ে উঠেছে, যেমন—পাঠভবন (বিদ্যালয়), শিক্ষাভবন (কলেজ), বিদ্যাভবন (গবেষণা বিভাগ), সঙ্গীতভবন, কলাভবন প্রভৃতি। শুধু লেখা পড়া নয়, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা নানা

রকমের শিল্প, ব্যায়াম এই সব শেখাবারও এমন সুব্যবস্থা র'য়েছে এখানে যে তেমনটি আর কোথাও নেই।

অন্য-সব স্কুল-কলেজে হেডমাষ্টার বা প্রিন্সিপাল ব'লতে যা বোঝায়, এখানে ঠিক সে ধরণের কিছু নেই। শিক্ষকেরা সবাই সমান। ছেলেরা অবাধে তাঁদের সঙ্গে মিশতে পায়। সকল বিষয়েই ছেলেদের স্বাধীনতা। ছেলেরা নিজেদের ভিতর থেকে একজনকে বেছে নেয়। সেই হয় তাদের নায়ক। নিজেদের কাজ নিজেরাই দেখে। কেউ কোন অন্যায় ক'রলে নায়ক তার বিচার করে। সে যা বলে, সবাইকে তা মেনে চলতে হয়। ছাত্র ও শিক্ষকদের সরল, অনলস ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রতে হয়।

এখানে ক্লাশের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ঘর নেই। খোলা মাঠে ঘাসের উপর, না হয় শাল, অশ্বত্থ বা আম গাছের তলায় ক্লাশ বসে। চেয়ার টেবিলের কোন হাঙ্গামা নেই। শিক্ষকেরা ছোট ছোট বেদীর উপর ব'সে ছাত্রদের পড়ান। পরীক্ষার সময় ছেলেদের উপর কোন পাহারা থাকে না। ছেলেরা যার যেখানে খুসি ব'সে উত্তর লেখে। এমনো দেখা যায়, কোন ছেলে হয়তো গাছের উপর চ'ড়ে উঁচু ডালে ব'সে উত্তর লিখছে। ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের অগাধ বিশ্বাস। ছেলেরা অবিশ্বাসের কাজ ক'রেছে, এমন ঘটনা খুব কম দেখা গেছে। খোলা মাঠ, খোলা হাওয়া আর বাইরের আলো বাতাসে থেকে ছেলেদের মন সুন্দর হ'য়ে গড়ে ওঠে।

ছেলেরা লেখাপড়া ছাড়া আরো কত রকমের কাজ নিয়ে থাকে। আশ্রমের নিকটে যে সকল গ্রাম আছে, সেখানকার লোকজনদের সঙ্গে তারা মেলামেশা করে—তাদের লিখতে পড়তে শেখায়। অসুখ-বিসুখ ক'রলে ওষুধ-পথ্য দেয়—সেবা-শুশ্রূষা করে। আপদ বিপদে তাদের সাহায্য করে। এইভাবে তারা গ্রাম সেবারও সুযোগ পায়। ছেলেরা এখানে নানা রকম ব্যায়াম শেখে, চিত্র বিদ্যা শেখে, গান বাজনা শেখে, অভিনয় ক'রতে শেখে, আর দেশ বিদেশের গুণীলোকদের সঙ্গে মিশে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার সুযোগ পায়।

এই সকল ব্যবস্থা শুধু যে ছেলেদের জন্যই তা নয়। ছেলেদের মতো মেয়েরাও যাতে আশ্রমে থেকে লেখাপড়া শিখতে পায়, তারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। লেখা পড়া ছাড়া, আরো কত জিনিস তারা শেখে, যেমন—রঙীন ছবি আঁকা, মাটি দিয়ে মূর্ত্তি গড়া, আলপনা দেওয়া, দেওয়ালে চিত্র করা, এই রকম সব সুন্দর সুন্দর কাজ। এ ছাড়া শেলাইয়ের কাজ, রান্নার কাজ, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা, এই সব গৃহকর্ম্মও তাদের শেখানো হয়। শুধু তাই নয়। ছেলেদের মত তারা চিত্র-বিদ্যাও শেখে, গান বাজনাও শেখে। মেয়েরাও ছেলেদের মতো গাছের ছায়ায় ব'সে বা খোলা জায়গায় ব'সে লেখাপড়া ক'রতে পায়।

মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়া করে একত্র। কিন্তু তাদের খেলার জায়গা, ব্যায়ামের জায়গা আলাদা। তাদের থাকবার জায়গাও আলাদা। যে সুন্দর বাড়ীটিতে মেয়েরা

থাকে, রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছেন—শ্রীভবন। শ্রী মানে লক্ষ্মী। মেয়েরা লক্ষ্মী। তাই কবি তাদের বাসভবনের নাম দিয়েছেন শ্রীভবন।

এই সঙ্গে শ্রীনিকেতনের কথা না ব'ললে বিশ্বভারতীর কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুরুলের শ্রীনিকেতন বিশ্বভারতীর একটি প্রধান অঙ্গ। ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ "শ্রীনিকেতন" প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে শ্রীনিকেতন স্থাপিত হয়। কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় আমরা যে শুধু অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ছি তা নয়, পুঁথির বাইরে যে সব দরকারী জিনিস আছে, সে সকলের দিকে আমাদের আগ্রহ একেবারেই নাই। শ্রীনিকেতনে যে সব ছেলে থাকে, তাদের নানা রকমের কাজ শেখানো হয়। যেমন—চাষ-বাসের কাজ, বাগ-বাগিচার কাজ, কাপড় বোনার কাজ, ছুতারের কাজ, কি রকম ক'রে গো পালন ক'রতে হয়, কি ভাবে রোগীর শুশ্রূষা ক'রতে হয়, এই রকম সব নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ ছেলেদের হাতে-কলমে শেখানো হয়। যারা কাজ শিখতে আসে তাদের বেশীর ভাগ ছেলেই পল্লীগ্রামের,—আশে-পাশের গ্রাম সকল থেকে আসে। ছেলেরা বড় হ'য়ে যাতে ঘর-সংসারের কাজে পাকা হ'য়ে উঠতে পারে, সেই মতোই শিক্ষা পায়।

গ্রামগুলিই হ'ল বাংলা দেশের প্রাণ; কারণ দেশের বেশীর ভাগ লোক গ্রামেই থাকে। অথচ বাংলার গ্রামগুলি এখন লোপ পেতে ব'সেছে। বাংলা দেশকে বাঁচাতে হ'লে,

গ্রামগুলিকে বাঁচাতে হবে। কেমন ক'রে তা হবে, তার উপায় রবীন্দ্রনাথের এই শ্রীনিকেতনে আছে। শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য, পল্লীর গৃহস্থ জীবনের কল্যাণ কিসে হবে, তার উপায় বিধান করা। আর সে উপায় পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা হবার নয়, তাই এখানে হাতে-কলমে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

এই হ'ল শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন অর্থাৎ বিশ্বভারতী সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। রবীন্দ্রনাথের বইগুলি যেমন এক একটি গীতিকাব্য, তাঁর বিশ্বভারতীও তেমনি একটি মহাকাব্য। আর রবীন্দ্রনাথ নিজে? তাঁর ব্যক্তিত্বের তুলনাই হয় না। সারা বিশ্ব খুঁজে বেড়ালেও এমন অসাধারণ মানুষ পাওয়া যাবে না।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই শান্তিনিকেতন। তিনিই এই আশ্রমের প্রাণ। ফুলের মধ্যে যেমন সুবাস, তিনি তেমনি সারা আশ্রমকে পরিব্যাপ্ত ক'রে রেখেছিলেন। নিজেরই হাতে গড়া তাঁর এই আশ্রম। গোড়ার সেই ছোটখাট ব্রহ্মাচর্যাশ্রমকে তিনি নিজের সাধনা ও কর্ম্মের প্রভাবে বিপুল বিশ্বভারতীতে পরিণত ক'রেছিলেন। শুষ্ক নীরস মরুর বুকে গ'ড়ে তুলেছিলেন প্রকৃতির লীলানিকেতন—সুন্দর শান্তিনিকেতন। এই শান্তিনিকেতন ছেড়ে কোথাও তিনি যেতে চাইতেন না। এখানকার ছাত্রছাত্রী, আশ্রমবাসীগণ ছিল তাঁর আপন জন। স্নেহ-প্রীতি দিয়ে ভালবাসা দিয়ে তিনি তাদের ঘিরে রাখতেন। আশ্রমবাসীদের তিনি গুরুদেব। ব্যাপকভাবে তিনি অনেকেরই

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব
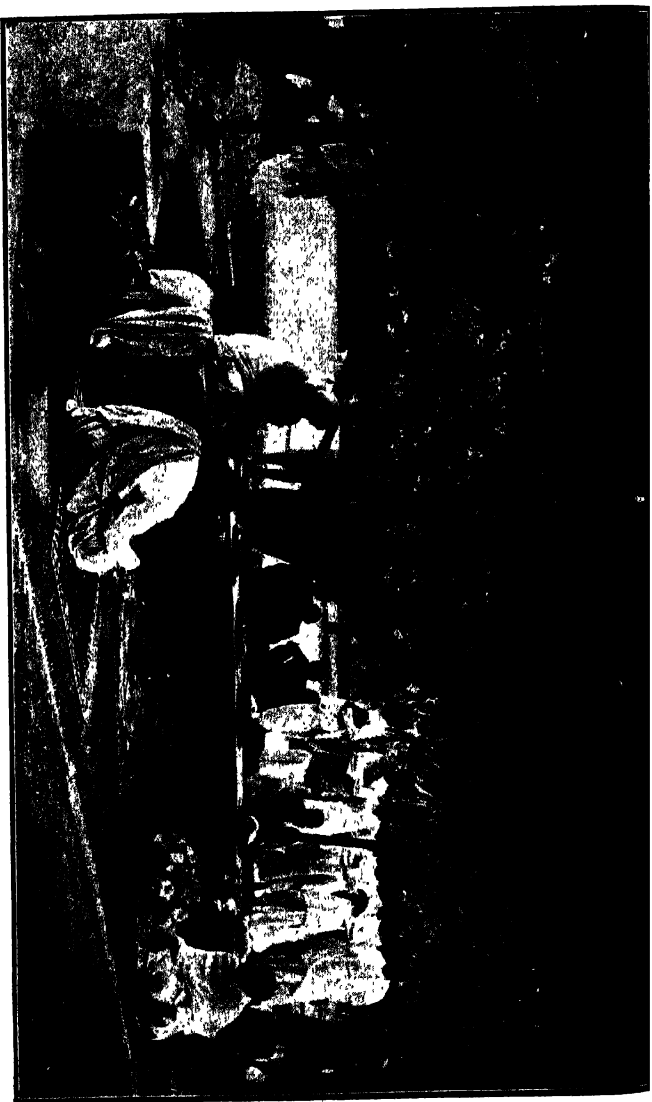
গুরুদেব। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল এঁরাও তাঁকে ডাকেন গুরুদেব বোলে। সত্যই তিনি গুরুদেব। সেই শুভ্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল, সুঠাম অবয়ব—বিধাতা তাঁকে যেন সকলের গুরুস্থানীয় ক'রেই পাঠিয়েছিলেন এই জগতে। যখন তিনি কোন উৎসবে যোগ দিতেন, উৎসব হ'য়ে উঠতো প্রাণবন্ত। তাঁর ধীর সৌম্য মূর্ত্তি, তাঁর অতি মধুর ও অপূর্ব্ব বাণী শুনে ভ'রে উঠতো সবার মন। আশ্রমের মন্দিরে উপাসনায় যখন তিনি এসে ব'সতেন, তখনকার সে দৃশ্য আরো অপূর্ব্ব। পূর্ব্ব গগনে প্রভাত-রবির কিরণচ্ছটা এসে পড়তো আশ্রম-রবির তেজোপূর্ণ মুখে। জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠতো তাঁর মুখমণ্ডল—আশ-পাশ ভ'রে উঠতো দীপ্তিতে, দেখে মনে হ'ত ঠিক যেন শূন্য মন্দিরে দেবতা আবির্ভূত হ'য়ে র'য়েছেন।

আশ্রমে যে সব ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তা খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। বর্ষা, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি ঋতু-প্রকৃতিগুলিকে অভিনন্দিত করা হ'ত উৎসবের মধ্য দিয়ে। কবিই ছিলেন এই সব উৎসবের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই সব ঋতুকে মূর্ত্তিমন্ত ক'রে তিনি যে সব নাটক রচনা ক'রেছেন, ঋতু উৎসবের সময় তার অভিনয় হ'ত। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেই তিনি অতি যত্ন ক'রে অভিনয় ও গান শেখাতেন। তিনি নিজেও অভিনয় ক'রতেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাঁর অভিনয়ের তুলনাই হয় না। ছেলেমেয়েদের সব রকমে আনন্দদান করা ছিল তাঁর চরিত্রের মাধুর্য। তিনি তাঁর

গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস এক একদিন সন্ধ্যার পর প'ড়ে শোনাতেন, শুনিয়ে মোহিত ক'রতেন ছেলে-মেয়েদের—আশ্রমবাসীদের।

তোমরা তাঁর কথা শুনে-শুনে কি ভাবছো? হয়তো ভাবছো যে, তিনি ছিলেন কবি, ভাবুক, কলা-রসিক, দার্শনিক, ধর্ম্মবেত্তা এবং একজন ঋষিকল্প মানুষ। আর যিনি এ ধরণের মানুষ, শ্রমসাধ্য কাজ তাঁর দ্বারা হ'ত না নিশ্চয়। তিনি আরাম ক'রে ব'সে থাকতেন, আর অন্য সকলে তাঁর হুকুম তামিল করতো। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। পরিশ্রম-সাধ্য কাজেও তিনি পেছপা' ছিলেন না কোন দিন। তাঁর শ্রীনিকেতনের কথা একটু আগেই তোমাদের ব'লেছি। শ্রীনিকেতন গ'ড়ে উঠেছে অনেক পরে। কিন্তু এই ধরণের কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করবার প্রবল উদ্যোগ ও আগ্রহ বহু আগে থেকেই তাঁর ছিল। এজন্য তাঁকে ভাবতে হ'য়েছিল, মেহনত ক'রতে হ'য়েছিল আর কষ্ট ক'রতে হয়েছিল অনেক। তাঁর সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা পাওয়া যায় নানা কাগজে, যেমন শনিবারের চিঠিতে, প্রবাসীতে এবং আরো বহু পত্রিকায়। এই সব থেকে তাঁর কথা কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে যাই। এতে মানুষ-রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাবে। দেশের কল্যাণের জন্য কবির কি ব্যাকুলতাই না ছিল! নিজে তিনি কি ব'লেছেন শোন—

"দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে

যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, ছন্দোবদ্ধরূপেই শুধু তা প্রকাশ পায়নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্ব্বস্ব খুব বেশী ছিল না ; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় ক'রে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্ম্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয়নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা ক'রে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত্ত নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। ...আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ ক'রে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্য্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার চেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল, পল্লীসংগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার, কুটীরশিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ—আমরা করিনি কি?"

তাঁর মতো মানুষে যে এত ক'রতে পারেন, তা দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয়। সাধারণ লোক ও গরীব লোকের দুঃখ কষ্ট তিনি অনুভব ক'রতেন প্রাণ দিয়ে। অন্য সব বড়লোকদের মত গরীবদের উপর লোক-দেখানো দরদ তাঁর ছিল না। এ সম্বন্ধে নানা ঘটনা আছে। একটি ঘটনার কথা বলি। অনেক বছর আগেকার কথা। বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক

টমসন সাহেব ও ছাত্রদের একবার তাঁকে বাঁকুড়াতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়। এজন্য খুব লেখালেখি চলছিল। রবীন্দ্রনাথের হাতে তখন অনেক কাজ। প্রথমে তিনি রাজি হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু কাজের ক্ষতি হবে দেখে শেষে তিনি অমত ক'রলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর লেখা একখানি চিঠির কিছু কিছু তুলে দিই। তিনি লিখেছেন,—

"...টমসন সাহেব বিরক্ত হইতে পারেন, সেজন্য আমি দুঃখিত আছি। কিন্তু তোমরা ত আমাকে জান, তোমরা কি জন্যে আমাকে অনাবশ্যক টানাটানি করিবার ইচ্ছা করিতেছ?...হাতে যে কাজ পড়িয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে সেই কাজের ক্ষতি হয়;...পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করে এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি...কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি।...এ সময়ে আমি যদি অতি শীঘ্র না যাই তবে অনুতাপ করিতে হইবে। ইহার উপরে গ্রামে ওলাউঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে—আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহারো খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে। একথা মনে রাখিয়ো আমি বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম—যে কাজের মধ্যে যাইতেছি তাহা আরামের

নহে, কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক···সে জায়গা মনোরম নয়, স্বাস্থ্যকর নয়, নির্জ্জন নয়, সেইজন্যই মন সহজেই সেখানে না যাইবার ছুতা খোঁজে···তোমরা আমাকে চেন, অতএব আমার উপরে এই বিশ্বাস রাখিয়ো যে, আমি দেহমনকে সামাজিক দায়িত্ব হইতে যেটুকু বাঁচাইয়া চলি তার কারণ আলস্য নয়, তার কাবণ, আমাব উপর কাজের ভার আছে সে কাজ আমাকে নির্ব্বাহ করিতেই হইবে।···"

রবীন্দ্রনাথকে দেশের লোক পৃথিবীর সেরা কবি ব'লেই জানে, কিন্তু কর্ম্মী হিসাবেও যে তিনি পৃথিবীর একজন সেরা কর্ম্মী ছিলেন তা এখনো অজ্ঞাত। নিজে তিনি একজন অসাধারণ কর্ম্মী ছিলেন ব'লেই দেশের জন্য সৃষ্টি ক'রে দিয়ে গেছেন একদল দরদী কর্ম্মী আর এমন কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী ক'রে রেখে গেছেন, যাতে দেশের কর্ম্মীর অভাব হবে না কোনদিনও। তাঁর কর্ম্মের আদর্শ ছিল অতি উচ্চ। একজনকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন—

"···মনটাকে ঠাণ্ডা রাখিয়ো—উন্মাদনাও ভাল নয় অবসাদও ভাল নয়—যাহা ঘটিতেছে তুমি তাহার উপলক্ষ্য মাত্র একথা মনে রাখিয়ো। আবার যদি গড়া জিনিস কখনো ভাঙে তখনো অবিচলিত থাকিতে হইবে। মনটাকে কাজের বহু ঊর্দ্ধে রাখিলে তবেই কাজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। লেশমাত্র অহমিকা যেন তোমাকে না আক্রমণ করে। যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ

ভুলিয়া কাজ করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আনন্দের সঙ্গে তাহার সাহায্য করে। যেই তুমি বলিবে আমি করিতেছি অমনি একলা পড়িবে।...”

“...তোমরা একবার ওখানকার হৃদয় অধিকার করে দাঁড়ালেই আর কোন ভয় থাকবে না। সে তোমরা নিশ্চয় পারবে আমি জানি। সেই পারাটা তোমাদের নিজের কৃতিত্বে হলেই তোমাদের যথার্থ জয় হবে। যে কাজে তোমরা প্রবৃত্ত হচ্ছ সেটা তোমাদেরি যথার্থ সৃষ্টিকার্য্য হয় এই আমার ইচ্ছা; তোমরা তার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিমাণে অনুভব করবে—যখন মূর্ত্তিটি গড়া হয়ে যাবে তখন তোমরা তার ভিতর নিজের জীবনের সাধনার প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাবে। আমি কেবল তোমাদের ক্ষেত্র দিয়েচি এই পর্য্যন্ত—এবং যদি কখনো তোমরা আমাকে কোন বিষয়ে তোমাদের সহযোগী করতে চাও তাহলে আমাকে পাবে।

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় হে—
ওহে বীর, হে নির্ভয়।”

কর্ম্মীদের প্রতি তাঁর এই উৎসাহ ও উপদেশ বাণী কর্ম্ম-জগতে প্রত্যেকেরই মাথা পেতে নিতে হয়।

তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে তিনি ছবিও আঁকতে জানতেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি ছবি আঁকার কাজ আরম্ভ

চিত্রাঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ

ক'রেছিলেন। এই আরম্ভটি ভারি মজার। তিনি যখন কবিতা বা গল্প বা কোন বিষয় লিখতেন, মাঝে মাঝে কাটাকুটি ক'রতেন। তাঁর এই কাটাকুটির ব্যাপারও ছিল সৌন্দর্য্যপূর্ণ। যাঁর সব-কিছুই সুন্দর, তাঁর এই তুচ্ছ কাটাকুটির কাজটাই বা অসুন্দর থাকবে কেন? তাঁর এই লেখার কাটাকুটি কখনো বা সুন্দর এক একটি ফুলে পরিণত হ'ত, কখনো বা দাঁড়াতো স্পষ্টভাবে অন্য এক ছবির আকারে। এই থেকেই ছবি আঁকার কথা তাঁর মনে জাগে আর তিনি ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। তাঁর ছবিও যেমন ছিল নূতন ধরণের, আঁকবার পদ্ধতিও ছিল তেমনি নূতন ধরণের, তিনি বলেছেন—

যেমন তেমন এরা আঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।

ছবি আঁকতে তিনি কিন্তু তুলি ব্যবহার করতেন কম। কলমের উল্টোদিক দিয়ে বা আঙ্গুলের ডগা দিয়ে রঙ লাগাতেন। এই রকম করে কত ভাবের কত ছবিই তিনি এঁকেছেন। তাঁর অনেক ছবি এদেশের ও বিদেশের শিল্পীদের কাছে উচ্চ প্রশংসা লাভ ক'রেছে। তাঁর ছবির খুব বেশী সমাদর হ'য়েছে বিদেশে—জার্ম্মানীতে সব চেয়ে বেশী। বার্লিনে ন্যাশন্যাল গ্যালারির জন্য তাঁর কতকগুলি ছবি কিনে রেখেছিল সমস্ত দেশের পক্ষ থেকে সেখানকার লোক। প্যারিসেও তাঁর চিত্রগুলির একটি প্রদর্শনী হয়। ফরাসী দেশের সবচেয়ে বড়ো সমজদার

তাঁর ছবি দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেয়ে বলেন, "তুমি যে কত বড়ো আমরা তা জানতুম, কিন্তু তুমি যে সত্যি এতই বড়ো তা জানতুম না।" তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। যে কাজে তিনি লেগেছেন, তাই সফল হ'য়েছে।

কবি লিখেছেন কত তা জান কি? শুনলে অবাক হবে। লিখেছেন প্রায় সতের-আঠারো হাজার বড় বড় পৃষ্ঠা। এত বই যে, তা নিয়ে একটি লাইব্রেরী হয়। আর তিনি ছবি আঁকতে আরম্ভ ক'রেছিলেন ক'বছরই বা! কিন্তু তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যা হবে প্রায় দু'হাজার।

তোমরা জেনেছ যে, কবি ছিলেন ইস্কুল পালানো ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি এড়িয়েই চ'লেছেন তাঁর জীবনে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই একে একে এসে নত হ'য়ে দাঁড়ালো শেষে তাঁর কাছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগেই তাঁকে ডি-লিট্ অর্থাৎ সাহিত্যাচার্য উপাধি দিয়ে সম্মানিত ক'রেছিলেন। তারপর অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত ক'রলেন,—যেমন কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়, ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।—শেষে সাগর-পারের অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটিও নেমে এলো বিশ্বভারতীর দ্বারে। তিনি তখন ছিলেন অত্যন্ত পীড়িত। সে জন্য অক্স্‌ফোর্ডের প্রতিনিধিরা তাঁর বিশ্বভারতীতে গিয়ে বাছাবাছা বিদ্বানদের নিয়ে এক সভা ক'রে তাঁকে এই উপাধি দিয়ে আসেন।

শাঁন্তিনিকেতনের কথা দিয়ে এই অধ্যায় আরম্ভ ক'রেছিলাম, এবার শান্তিনিকেতনের কথা দিয়েই শেষ করি। তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাবধারা ও শ্রীনিকেতনের কর্ম্মধারা "বিশ্বভারতী" মূর্ত্তিতে এখন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আমাদের এই ভারতবর্ষ চিরদিন ছিল মহামানবের মিলন ক্ষেত্র। এখানে সবারই অবারিত দ্বার। কত কত ঋষি, মহাঋষি এখানে আবির্ভূত হ'য়েছেন। তাঁদের চিন্তাধারা হ'য়ে র'য়েছে চিরন্তন ও অবিনশ্বর। ঋষি রবীন্দ্রনাথ ভারতের সেই সব বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে ফিরিয়ে এনেছেন আপনার সাধন বলে আর প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন তাকে নূতন রূপে ও ভাবে বিশ্বভারতীর মধ্যে। এর উদ্দেশ্য "আপনাকে সকলের যোগে পূর্ণ করা—কর্ম্মের ভিতর দিয়া গুহাগ্রন্থি ক্ষয় করা—বিশুদ্ধ হওয়া, আনন্দিত হওয়া, ঈশ্বরে সমাহিত হওয়া,—তারি মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃত ব্যাপক আয়োজন আছে, দেশ-চর্চ্চা আছে—সংসার-সমাজের মঙ্গল সাধন আছে।" রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—সমস্ত বিশ্বকে এখানে নীড় ক'রবো, সমস্ত বিশ্ব এখানে এক-নীড় হবে, তা হ'লে মানুষের মধ্যে সেই অসীমকে, সেই ভূমাকে উপলব্ধি ক'রবো। বাইরের সঙ্গে যাওয়া-আসার পথ প্রশস্ত ক'রতে পারলে, নির্ম্মল প্রাণ পরিপূর্ণ হাওয়া সকল কলুষ দূর করবে।

বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববাসীর আকর্ষণের বস্তু। গুণী-জ্ঞানীর তো কথাই নেই, দেশ-বিদেশ হ'তে রাজা মহারাজা, এমন কি, বড় বড় রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত—যাঁদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার সীমা

নেই—বিশ্বভারতীতে এসে কবির দর্শন লাভ ক'রে, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে, তাঁর মুখের বাণী শুনে কৃতকৃতার্থ হ'য়ে গেছেন। নানা দেশ হ'তে কত অর্থ, কত উপহার এসেছে—বিশ্বভারতীর জন্য। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর, জামনগরের জাম-সাহেব বহু অর্থ দিয়েছেন বিশ্বভারতীর সেবায়। কোথায়, কত দূরে মিসর! সেই মিসরের রাজা ফুয়াদ অনেক ভাল ভাল আরবী বই বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারটি জগতের দুর্লভ দুর্লভ গ্রন্থে এখন পরিপূর্ণ। এই সকল গ্রন্থ তিব্বত, চীন, জাপান, আমেরিকা আর ইউরোপের নানা দেশ থেকে উপহার এসেছে। একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও এই গ্রন্থাগারটি অধিক মূল্যবান। এখানে সকল দেশের সকল জাতীর ছাত্রেরই স্থান আছে, আর সব রকম ভাষারই চর্চ্চা হয়। 'হিন্দিভবনে' হিন্দি, গুজরাটী এই সব ভাষা শেখানো হয়। নিজাম সরকারের অর্থানুকূল্যে এখানে 'মুসলিম্-সংস্কৃতি ভবন' স্থাপিত হ'য়েছে। মহাচীনের সঙ্গে সংস্কৃতিগত যোগাযোগ রাখবার জন্য 'চীনাভবন' প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীকে বিশ্বের যত সব গুণীলোকের জ্ঞানীলোকের মিলন-তীর্থ ক'রে গেছেন। তাঁর এই পুণ্যতীর্থে ইউরোপ ও আমেরিকার, চীন ও জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণ কতবার এসেচেন—জ্ঞান আলোচনা করবার জন্য ও কবির সাহচর্য লাভ করবার জন্য। এঁদের এই মেলা-মেশার ফলে ও-সব দেশের সঙ্গে এ-দেশের ঐক্যের পথ সুগম হ'য়েছে।

বাঙলা দেশ ধন্য, যে তাঁর মতো মহামানব এখানে জন্মেছেন। বাঙালী আমরা ধন্য, যে তাঁকে আমরা পেয়েছি আমাদেরই মধ্যে। তিনি বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল ক'রেছেন—ভারতের গৌরব বাড়িয়েছেন। তিনি যে একদিন ব'লেছিলেন,—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগরতীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।

ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

... ...

রণধারা বাহি, জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি-পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে॥

তাঁর এই বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হ'য়েছে। তাঁর এই রুদ্রবাণী যুগের পর যুগ ধ'রে মহাকাশে ধ্বনিত হ'তে থাকবে

ঘরের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তিটি ছিল মহামহিম সম্রাটের মতো তেজ ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। তাঁর সামনে এলে, যে যত বড়ই হোক্ না, মাথা তার আপনাআপনিই নত হ'য়ে যেতো সসম্ভ্রমে। কিন্তু আসলে রবীন্দ্রনাথ মানুষটি ছিলেন কেমন? তিনি যে কত সহজ সরল মানুষ ছিলেন, তোমাদের মতো ছোটদের সঙ্গে মেলা-মেশায় তার কিছু কিছু পরিচয় আগেই তোমরা পেয়েছ। তাঁর জীবন-যাত্রার ধরন-ধারণ কি রকম ছিল, বাড়ীতে তিনি লোকজনের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার ক'রতেন, কি ভাবে থাকতেন এ সব কথা জানবার খুবই তোমাদের আগ্রহ হ'তে পারে।

তোমরা হয়তো ভাবছো, না জানি কত বড়-মানুষী চালেই তিনি থাকতেন নিজের বাড়ীতে। আর হয়তো ভাবছো যিনি অতবড় লোক, না জানি তিনি আহার করতেন কি অপরূপ জিনিসই। কিন্তু এসবের কোন কিছুই ছিল না তাঁর। তাঁর অট্টালিকার অবশ্য অভাব ছিল না। কিন্তু খুব বেশী বড় ঘরে থাকাটা তিনি আদবেই পছন্দ করতেন না। ছোট ঘরে থাকতেই তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন, "...ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশী আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশী বাইরে সরে দাঁড়ায়।..." তিনি

থাকতেন ছোট ঘরে। তার আসবাবপত্র আর সরঞ্জাম সামান্য, অর্থাৎ বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার, তার বেশী কিছুই তিনি রাখতেন না।

শান্তিনিকেতনে 'উত্তরায়ণ' হ'ল প্রকাণ্ড অট্টালিকা। উত্তরায়ণের উত্তর দিকে ছোট একটি বাড়ী—নাম 'শ্যামলী'। আগাগোড়া একেবারে মাটির তৈরী। বলেছেন তিনি—

"আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;"

... ...

শ্যামলীর ছাদ সুদ্ধ মাটির। এই মাটির কুটীরে তিনি বহুকাল ছিলেন পরম আনন্দে।

খুব ভোর বেলা তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। এত ভোরে যে পাখীরাও তখন জাগতো না। ভোর বেলা উঠে সব প্রথমে তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে উপাসনা ক'রতেন। তারপর আরম্ভ ক'রতেন দিনের কাজ। কাজে তাঁর কোন সময় ক্লান্তি ছিল না। নানা রকমের কাজ তিনি ক'রতেন, যেমন—আশ্রমের হিসেব পত্র দেখা, হাট-বাজারের ফর্দ্দ পরীক্ষা করা, জমা খরচের হিসেব দেখা, যে সব চিঠিপত্র আসতো নিজের হাতে তার জবাব দেওয়া,

ইত্যাদি। আলস্য ব'লে তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না। দিনের বেলা কেউ তাঁকে কোন দিন ঘুমুতে দেখে নি।

দেশবিদেশ থেকে কত লোক আসতো তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে। কাউকে তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করেন নি, সকলকেই যথাযোগ্য সমাদরে গ্রহণ ক'রতেন। অপরকে খাওয়ানোতে তাঁর ছিল খুব আনন্দ। বাঁড়ীতে কোন অতিথি এলে তার সুখ-সুবিধার দিকে নিজেই তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

নিজের আহার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তিনি ভারি সব মজার ব্যাপার করতেন। একবার তাঁর ঝোঁক হ'ল যে, শুধু কেবল সিদ্ধ জিনিষ খাবেন। তখন চললো কিছুদিন ধ'রে সিদ্ধ খাওয়া। মুলো সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, পেঁপে, গাজর কপি সবই চললো সিদ্ধ করে খাওয়া। হঠাৎ একবার ঠিক করলেন যে, শুধু কেবল শুকনো খাবার খেয়ে থাকবেন। তখন তাঁর খাদ্য হল খই, মুড়ি, ছাতু, রুটি এই সব। তারপর ইচ্ছা হ'ল যে কাঁচা আনাজ খাবেন। অমনি সুরু হ'য়ে গেল কাঁচা শাক-সব্জী খাওয়া। যে সকল শাক-সব্জী বা ফল রান্না না ক'রে মুখে দেওয়া যায় না, কবি তাই অক্লেশে কাঁচা খেতে আরম্ভ করলেন। এই ভাবে খাবার জিনিস নিয়ে নিজের উপর পরখ করবার ঝোঁক ছিল তাঁর অসাধারণ রকমের। এতে তাঁর শরীর যে খারাপ হ'ত না এমন নয়, তবু তিনি একটা ছেড়ে আর একটা ধ'রতেন।

একবার চললো নিম খাওয়ার পরখ। ভাত খাবেন তাতে নিম, তরকারিতে নিম। সরবৎ খাবেন তাতেও নিম। খেতেন কিন্তু রীতিমতো তারিফ ক'রে। এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। এখানে সেটি উদ্ধৃত ক'রে দিই,—"এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনে ব'সেছেন—ছ'জনকেই খাদ্য বস্তু পরিবেষণ করা হয়েছে সমান ক'রে, বরং অভ্যাগতকে একটু বেশী করেই দেওয়া হয়েছে কোন কোন জিনিষ। শুধু কবিকে একটা তরকারি-মতো জিনিষ আলাদা ক'রে দেওয়া হ'ল, যা' থেকে তিনি বাদ পড়লেন। ভদ্রলোক কৌতূহল বশে দেখতে লাগলেন বারবার—ওটা কি পদার্থ! কবি বুঝতে পেরেই বললেন, 'এইত, এ সব পক্ষপাতিত্ব আমি একদম পছন্দ করি না—আমি রবীন্দ্রনাথ, অমি টপ ক'রে একটা প্রস্থ আমায় বেশী দিয়ে দিলে! তা এই···ওরে দে দে বাবুকে ঐটা একটু।' দেওয়া হ'ল—মুখে দিয়েই বাবু চমকে উঠলেন, আর কিছু নয়, খাঁটি নিমপাতা বাটা!"

এদিকে মহামহিম সম্রাটের মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ মূর্ত্তি, অথচ তাঁর কথাবার্ত্তা ছিল অত্যন্ত সুরসাল আর তিনি পরিহাসপ্রিয়ও ছিলেন কম নয়। এ সম্বন্ধে ছ'একটি গল্প উদ্ধৃত করি। অবশ্য এ সব গল্প নয়, সবই সত্য কথা।

অনেকদিন আগের কথা। কবি তখন রামগড় পাহাড়ে ছিলেন। একদিন বেলা প্রায় নটায় দেখা গেল, কবি তাঁর ডান পায়ের মোজা খুলে পায়ের তলা হাত দিয়ে ঘসছেন। কি

হ'য়েছে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি বেশ হাসি মুখেই বললেন, চরণপদ্ম চরণকমল ইত্যাদি শব্দ বহুদিন শুনছি, কবিতায় ঐ সব কথা ব্যবহারও করেছি, কিন্তু, কেন যে তাকে চরণকমল বলে, সেটা আজ সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করেছি। এই দেখ না, এত জায়গা থাকতে গরম মোজার বন্ধন ভেদ করে একেবারে পায়ের তলায় দিলে হুল বিঁধিয়ে মৌমাছিটা। চরণ যদি কমল না হবে, তা হ'লে কি মৌমাছি এমন কাণ্ড করতো?

আর এক দিনের কথা। শান্তিনিকেতন আশ্রমের একজন শিক্ষক মহাশয়ের হঠাৎ ডাক পড়লো তাঁর কাছে। কবির কাছে তিনি উপস্থিত হ'তেই, কবি তাঁকে গম্ভীর ভাবে বললেন, মাষ্টার মশায়, ছেলেরা ক্লাসে বিলম্বে এলে আপনারা তাদের দেন শাস্তি কিন্তু শিক্ষকেরা ক্লাসে বিলম্বে উপস্থিত হ'লে তাঁরা কি দণ্ড পাবার যোগ্য নন? মাষ্টার মশায় এই কথা শুনে মাথা চুলকে বললেন, নিশ্চয়ই। কবি বললেন, ঠিক বল্‌ছেন তাঁরা দণ্ড পাবার যোগ্য? মাষ্টার মশায় উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, দণ্ড পাবার যোগ্য। কবি গম্ভীর হ'য়ে বললেন, তা হ'লে সেজন্য যদি আমি আপনাকে দণ্ড দিই, আপনি আপত্তি করবেন না, স্বচ্ছন্দ চিত্তে নেবেন? আচ্ছা, তার পূর্ব্বে একটু চা-জলযোগ সারুন, দক্ষিণা দেব তারপর। চা-জলযোগ সারা হ'ল, কিছুক্ষণ গল্প হ'ল। শিক্ষক মহাশয় উঠে দাঁড়ালেন চলে যাবার জন্য। কবি ব'ললেন, বেশ মশায়, দণ্ড নিয়ে যান।—এই ব'লে কবি পাশের ঘরে গিয়ে একটি বেতের লাঠি এনে শিক্ষক মশায়কে

দিলেন। লাঠি পেয়ে শিক্ষক মশায় ও আর যাঁরা সেখানে ছিলেন, হো হো করে হেসে উঠলেন। ব্যাপারটা এই যে, শিক্ষক মশায় আগের দিন এই লাঠিটা এখানে ফেলে গেছলেন। শিক্ষক মশায়কে জব্দ করবার জন্য কবি লাঠি গাছটি রেখেছিলেন লুকিয়ে। ফেরত দিলেন এই রকম ভাবে। বললেন, মাষ্টার মশায়৺এ দণ্ডটি আপনার প্রাপ্য ছিল, এই জন্য আমি আপনাকে দণ্ড দেবার দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম। আশা করি, আপনি এটি স্বচ্ছন্দ চিত্তেই গ্রহণ ক'রলেন।

যখন তিনি রোগ শয্যায় শুয়ে, দেহ যেতে লাগলো শুকিয়ে কিন্তু মন তাঁর শুকিয়ে যায় নি। রোগ-গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও করতেন রসের সৃষ্টি। তাঁর আদরের নাতনী নন্দিতা তাঁর শুশ্রূষার ভার নিয়েছিলেন। শ্রীমতী নন্দিতার ডাক নাম বুড়ী। নন্দিতা খুব নৃত্যকুশলা। একদিন কবি তাঁর সম্বন্ধে মুখে মুখে ছড়া তৈরী ক'রলেন—

"হে শ্রীমতী নন্দিতা
নাচের ছন্দে ছন্দিতা,
'বুড়ী' তোমায় বলে জেনো
উল্‌টে বলার ফন্দি তা।"

নন্দিতা প্রত্যহ ভোরের বেলা এসে তাঁর মুখ হাত ধুইয়ে, চুল, আঁচড়ে, চশমা পরিয়ে তাঁকে বাইরের চৌকিতে বসিয়ে

দিতেন। একদিন নাতনী তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি সকৌতুকে ছড়া কাটলেন—

"ওরে মোর দোস্ত
আজকে সকাল বেলা মেজাজটা খোস তো ?
একটু সময় নিয়ে কাছে তুই বোস্ তো
কেন তুই চলে যাস করি নাই দোষ তো ?"

কবির এই রকম রসিকতাময় উক্তি যে কত আছে তা ব'লে শেষ করা যায় না। চাকর-বাকরেরা কোন অন্যায় ক'রলে বা দোষ ক'রলে, তিনি তাদের ভৎর্সনা ক'রতেন অবশ্যই কিন্তু যে ভাবে ক'রতেন তার দু'একটি নমুনা এখানে না দিয়ে থাকতে পারলুম না।

একবার একটা খুব দামী ল্যাম্প অত্যন্ত অসাবধানতার দরুণ চাকরের হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। তাঁর অতি প্রিয় বস্তু। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'লেন। চাকরটা কি ভয়ঙ্কর শাস্তিই বা পায়! অপরাধী হাজির হ'ল, তিনি তাকে ভীষণ বকলেন, তার ভাষা এই—"তোদের এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই, এতটুকু সতর্কতা নেই, মনিবের জিনিসের উপর কোন মায়া নেই···।" ব্যস্, এই পর্য্যন্ত।

একজনের চুরি ধরা পড়লো। এবারেও তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'লেন। তাকে এই ব'লে তিরস্কার ক'রলেন—"হিসেবে গোলমাল হ'লে তাকে তো তস্করতা আখ্যা দেওয়া যায়···"

ইত্যাদি। তাঁর এই তিরস্কারের ভাষা শুনে আড়ালে কেউ কেউ হাসছিলেন। শুনতে পেয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "ভুল করো না। শুধু চর্ম্মভেদ করলেই মর্ম্মে পৌঁছনো যায় না। মানুষ গুপ্তমর্ম্মী; তার গোপন ঘরে প্রবেশের পন্থা অন্য।"

তাঁকে কবি ব'লেই সকলে জানে। কিন্তু নানা বিষয়ের বইও তিনি পড়েছেন বিস্তর। ইংরাজীতেও হেন বিষয় নেই যা তিনি পড়েন নি। হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা তিনি খুব ভাল জানতেন আর খুব ভাল চিকিৎসা ক'রতে পারতেন। যখন কোন রোগী হাতে নিতেন, কি ক'রে তার রোগ সারাবেন, সেই হ'ত তাঁর প্রধান চিন্তা। চাকরদের তখন অন্য কাজ ছেড়ে কেবলই ছুটোছুটি করতে হ'ত রোগীর বাড়ী—কখনো বা ওষুধ দিতে, কখনো বা খবর আনতে। কত লোকের কত কঠিন অসুখ তিনি সারিয়ে দিয়েছেন। তিনি রহস্য ক'রে অনেক সময় ব'লতেন, আমি ফী নিই না ব'লে আমার পশার হোল না।

লোকে তাঁকে সুখী বলেই জানে। কিন্তু তিনি লোকের সেবা-পরায়ণও যে কত বেশী ছিলেন, তা খুব কম লোকেরই জানা আছে। এ সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনার কথা বলি।

তিনি তখন থাকতেন শিলাইদহে। শিলাইদহে পথচল্‌তি একটি হিন্দুস্থানীর কলেরা হয়। কলেরা হ'য়ে লোকটি রাস্তায় প'ড়েছিল। একে রাস্তার লোক, তার উপর কলেরা। কে দেখবে তাকে! খবরটি রবীন্দ্রনাথের কানে গেল। খবর পেয়েই তিনি তাকে রাস্তা থেকে তুলিয়ে এনে তাঁর কুঠী বাড়ীতে

রাখলেন। নিজে তাকে ওষুধ-পত্র খাওয়াতে লাগলেন ও তার সেবা যত্ন ক'রতে লাগলেন। লোকটি কিন্তু বাঁচলো না। ছ'দিন পরে কুঠী বাড়ীতেই মারা গেল। এই ছদিন তিনি লোকটির বিধিমত সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন বিনা সঙ্কোচে ও নির্ভয়ে। তিনি ছিলেন নির্ভীক। কেননা, অন্তরে তিনি ছিলেন মৃত্যুজয়ী,—যা সাধারণ মানুষে নয়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্র শক্তিমান পুরুষ আর দেখা যায় না। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্থান পৃথিবীর সকল প্রতিভাশালী লোকের উপরে। তিনি বিজয়ী বীরের মতো বিশ্ব বিজয় ক'রে এসেছেন, এক-আধবার নয়—বারো বার। তাঁর গৌরবে বাঙ্গালী গৌরবান্বিত—বিশ্বের দরবারে ভারত সম্মানিত। তাঁর সত্তর বছর পূর্ণ হ'লে পর তাঁকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য ও তাঁকে আরো বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন হয় ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে।

সম্বর্দ্ধনার জন্য এমন আয়োজন আর কখনো কোথাও হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। এই আয়োজন যেমন বিরাট, তেমনি আনন্দপূর্ণ। উৎসবের স্থান ছিল কলিকাতার টাউন হল ও সম্মুখের খোলা জায়গা। এই উৎসবে শুধু বাঙ্গালীই নয়, সারা ভারতের লোক আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, যেমন—মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মান্দ্রাজী, ওড়িয়া, বিহারী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পার্সী—সকল ধর্ম্মের লোকই এই উপলক্ষে সমবেত হ'য়েছিলেন। দেশের যত সব সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের জনতা হ'য়েছিল এই উৎসবে। রাজা-মহারাজা, বড় বড় ধনী, জমিদার, ব্যবসাদার, জজ, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক, শিক্ষক—

কোন শ্রেণীর লোকই বাদ ছিলেন না এই আনন্দ-উৎসবে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে ও যোগ দিয়ে ধন্য হ'তে। ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষ থেকেও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এই সভায় কবিকে অভিনন্দিত করবার জন্য। পৃথিবীর আরো নানা স্থান থেকে অভিনন্দন এসেছিল। পারস্যের শাহ্ ও শ্যাম দেশের রাজা কবিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

উৎসবের দিন সে কি সমারোহ! সভায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক সমবেত হ'য়েছিল। কবি উৎসবের স্থানে প্রবেশ ক'রলেন শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তিনি যখন সুশোভিত মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করা হ'ল—

জনগনমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।

সমস্বরে এই গানটি গেয়ে। যতক্ষণ এই গানটি গাওয়া হ'ল সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কবিকে অর্ঘ দেওয়া হ'ল। অর্ঘের উপকরণ—চন্দন, ফুলের মালা, জলশঙ্খ, ধূপ, দীপ, দুর্ব্বা—এই সব। দুটি ছোট ছোট মেয়ে কবির দু' পাশে দাঁড়িয়ে চামর ঢুলাচ্ছিল। ফুলের ও ধূপের গন্ধে স্থানটি হ'য়ে উঠেছিল আমোদিত ও সৌরভময়। সকলের মনে শ্রদ্ধা ও আনন্দ। কবির সভা-আলো-করা শান্ত, সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! যেন এক মহামহিম সম্রাটের দিগ্বিজয়ের উৎসব! যেন এক মহারাজাধিরাজের অভিষেকোৎসব!

এমনটি আর কখনো হয় না। কবিকে অর্ঘ দেওয়ার পর প্রশস্তি পাঠ হ'ল। তার কথাগুলি এই—

যাঁহার প্রাচী ও প্রতীচি বলিয়া ভুবনে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, যিনি সতত নিজের কর্ম্মের দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন যে তিনি মিত্র, বিশ্বই যাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান, এবং সত্যেই যিনি নিয়ত অবস্থান করেন, সেই রবির অবিরাম জয় হউক ও তাহা দ্বারা জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক!

তারপর অভিভাষণ পাঠ করা হ'ল বহু প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতির পক্ষ থেকে। যে সব অভিনন্দন পত্র কবিকে উপহার দেওয়া হ'ল, তার সবগুলিই অত্যন্ত পরিপাটী ও সুন্দর ক'রে তৈরী। তার কোনটি-বা রূপার ফলকে সোনার অক্ষরে লেখা, কোনটি-বা তামার ফলকে খোদাই করা আবার কোনটি-বা সোনার ফলকে এনামেলের অক্ষরে লেখা। কবি পৃথক পৃথক ভাবে সকল অভিনন্দনেরই উত্তর দিলেন। কলিকাতার পুরবাসীদের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন দেওয়া হ'ল, তার উত্তরে কবি যে আশীর্ব্বাদ দিলেন, তার কিছু উদ্ধৃত করি,—

* * *

"এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে, আরোগ্যে, আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক; ইহার প্রবর্ত্তনায় চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত

হউক; সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী স্খালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক—এই আমি কামনা করি।"

পুরবাসীদের জন্য মঙ্গল কামনা এর চেয়ে বেশী আর কিছু হ'তে পারে কি? এমন বিপুল ও অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান এর আগে এদেশে আর কখনো হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। ২৫শে ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই বারোদিন ব্যাপী উৎসব হ'য়েছিল নিয়মিত ভাবে। সে কি সমারোহ! কথকতা, যাত্রা, বাউলগান, কীর্ত্তন, পল্লীনৃত্য, পল্লীগান, নানারকমের খেলা প্রভৃতি বাংলার যা নিজস্ব, তার সব কিছুরই আয়োজন ছিল। উৎসবে প্রতিদিন অসংখ্য লোক উপস্থিত হ'ত। চমৎকার একটি প্রদর্শনীও খোলা হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা নানা ছবি, তাঁর হস্তলিখিত বহু কবিতা, বিদেশের নানা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর যত বই এই প্রদর্শনীতে দেখানো হ'য়েছিল। উৎসবের দিনগুলি যে কি আনন্দের ছিল, তা আর ব'লে শেষ করা যায় না।

বাংলার ছাত্র ও ছাত্রীগণও কবিকে অভিনন্দিত ক'রলেন

এই উৎসবে। ছাত্র ও ছাত্রীদের প্রতি কবির বাণী ছিল অপূর্ব্ব। তার কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিই :—

…আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার তাতে কখনও ক্লান্ত হ'ল না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি।…আনন্দ কর তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেচে, যা রয়েচে তোমার চারিদিকে, তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ ক'রো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মত জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ ক'রে দেয়, তাতে গ্লানি আসে ক্লান্তি আনে।…আমি ভাল বেসেচি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেচি মহৎকে, আমি কামনা করেচি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেচি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।…আমি এসেচি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—

… … …

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

সমগ্র বাঙ্গালীর পক্ষ থেকে কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ দেওয়া হ'ল এই ব'লে,—

"কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।...

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি।"

সে-দিনকার সেই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে আজও অক্ষয় হ'য়ে রয়েছে আর চিরকাল ধ'রে তা থাকবেও।

অমর রবীন্দ্রনাথ

১৩৪৮ সাল—পৃথিবীর ইতিহাসে এই একটি স্মরণীয় বৎসর। ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিনের উৎসব। শান্তিনিকেতনে তাঁকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন হ'ল অতি সুন্দরভাবে। কিন্তু কবিকে সামনে রেখে এই যে তাঁর শেষ জন্মদিনের উৎসব, তখন কে তা জানতো! নববর্ষে তিনি সেদিন যা ব'লেছিলেন, আশ্রম বাসীদের প্রতি তাই তাঁর শেষ আশীর্বাণী :—

"আশ্রমবাসী কল্যানীয়গণ, তোমরা আজ আমাকে অভিনন্দন করে উপহার বহন করে এনেছ, পরিবর্তে আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের প্রার্থনা জানিয়েছ। প্রত্যহ নীরবে আমার আশীর্বাদ তোমাদের প্রতি ধাবিত প্রবাহিত হয়েছে, দীর্ঘকাল নিরন্তর তোমাদের অভিষিক্ত করেছে। আমার আশীর্বাদ আজ নূতন বেশে তোমাদের কাছে উপস্থিত হোক, সুন্দর বেশে তাকে তোমরা গ্রহণ করো।

জন্মকালে আমরা যে আত্মীয় লাভ করি তার মধ্যে কোনো চেষ্টা নেই, জীবন লক্ষ্মীর যে অযাচিত দান, তার মধ্যে আমাদের কোনো গৌরব নেই। তার পর জীবন যাত্রার পথে-পথে যদি আত্মীয় সংগ্রহ করতে পারি তবে সেই তো গৌরবের বিষয়, সেই আত্মীয়তা আরো গভীর, অকৃত্রিম, মূল্য তার অনেক বেশী—আশীর্বাদ সেই তো বহন করে আনে। আজ যে তোমাদের সকলের হৃদয়ের দান বিধাতার আশীর্বাদরূপে আমার কাছে উপস্থিত এ এক

আশ্চর্য ঘটনা। কোন্ দূরে পরিবারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমার বাল্যলীলা আরম্ভ, আমি কাউকে জানতুম না, দু'চারজন আত্মীয়ের মধ্যে আমার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভাবি, বিধাতা আমার জীবনে কী খেলা খেললেন, সেদিন তো এ-কথা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রচলিত ভাষায় যাকে আত্মীয় বলে তোমরা তা নও, তাই তোমাদের প্রীতি এত মূল্যবান। এই নব বৈশাখের উৎসবে তোমরা যে উপহার পুঞ্জীভূত করে এনেছ কৃতজ্ঞ অন্তরে তা গ্রহণ করি। আমার মতন সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে, শুধু যে আমার স্বদেশীয়েরাই আমাকে ভালোবেসেছেন তা নয়, সুদূর দেশেরও অনেক মনস্বী তপস্বী রসিক আমাকে অজস্র আত্মীয়তা দ্বারা ধন্য করেছেন। সকলের এই স্নেহ মমতা সেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি, প্রণাম করে যাই তাঁকে, যিনি আমাকে এই আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করেছেন।"

কিন্তু আমাদের সবাইকে একান্তভাবে আপনার ক'রে নিয়ে, আমাদের জন্য বাণীর দেউল নির্ম্মাণ ক'রে দিয়ে কোথায় গেলেন রবীন্দ্রনাথ? যে রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে আমরা ধন্য হ'য়েছিলাম, দেশ ধন্য হ'য়েছিল, সমগ্র বিশ্ববাসী ধন্য হ'য়েছিল তিনি আজ কোথায়? তাঁরই দেওয়া চিন্তাধারা, তাঁরই দেওয়া ভাবসম্পদ এ যুগে মানুষের প্রধান অবলম্বন। সখ্য প্রীতি, মৈত্রী প্রেম, সভ্যতা ভব্যতা, এক কথায় ব'লতে মানুষকে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হ'লে যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই তো শিখিয়ে গেছেন

তিনি। তিনি আমাদের আত্মবোধ জাগিয়ে গেছেন। বলেছেন,—তোমরা আত্মবিশ্বাসী হও—নিজেকে নিজে প্রতিষ্ঠা কর। তিনি শিখিয়েছেন অমর হ'তে—মৃত্যুজয়ী হ'তে—

প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়,
তোমারি হউক্ জয়!

তাঁর মুখে ধ্বনিত হ'য়েছে ঋষির মন্ত্র—যার প্রভাবে পাপ ও গ্লানি মুছে যায় ধরা পৃষ্ঠ হ'তে। সূর্য্যদেবের মতো এমন ভাবে তিনি আমাদের আলো দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন যে, তা আবার যে কোন কালে নিভে যাবে, সে ধারণাও ছিল অসহ্য। কিন্তু যা ধারণা ক'রতেও মন চায় না, তাও হ'য়েছে সম্ভব। বাংলার রবি অস্ত গেছেন। ৮১ বৎসর পূর্ব্বে যে বাড়ীতে তিনি ক্ষুদ্র শিশু হ'য়ে জন্মেছিলেন, ৮১ বৎসর পরে—১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ—সেই বাড়ীটিতেই "জনগনমন-অধিনায়ক" দেহ রেখেছেন। একাশী বৎসর তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে মানুষকে তিনি নানা ভাবে কেবল আনন্দই দিয়ে গেছেন আর যে ভাব-ঐশ্বর্য রেখে গেছেন, একটা বিরাট সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের চেয়েও তা বড়। জগতের কল্যাণে নিজেকে তিনি নিঃস্ব ক'রে দিয়ে

গেছেন, বিশ্বজনের সেবায় উৎসর্গ ক'রে গেছেন নিজের জীবনটিকে—

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেইত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেইত আমার তুমি।

এমন অকুণ্ঠবাণী যাঁর, তিনিই তো সদা কল্যাণময় ঋষি! হে ঋষি, তুমি আমাদের জীবনে পরম কল্যাণময় রূপেই এসেছিলে—তোমায় নমস্কার করি।

কবির বিদায়ের ক্ষণটিও ছিল কি বৈচিত্র্যপূর্ণ! সে দিন ছিল ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব। ঐ দিন দেবতার ও মানুষের অপূর্ব্ব আনন্দ উৎসবের দিন। ঐ উৎসবের মাঝেই কবি নিলেন পৃথিবী থেকে বিদায়। কবি আজীবন চিরসুন্দরের পূজারী। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ছিল সুন্দরের পরম প্রকাশ। তাই তাঁর বিদায়ের ক্ষণে—

ভুবন বলে, তোমার তরে
আছে বরণ-মালা,
গগন বলে তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে,
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

এইরূপ অপূর্ব্ব অভিনন্দনের মধ্য দিয়েই সুন্দরের পূজারী গিয়ে মিলিত হ'লেন চিরসুন্দরের সাথে।

ঐ দিন তাঁর বিদায় লওয়ার বেশটিও কি সুন্দর! এর একটি করুণ-সুন্দর বর্ণনা আছে প্রবাসীতে শ্রীসেবিকার লেখায়। তার কিছু তুলে দিই নিজের কথায়। নতুন গাছের চাঁপা ফুল অঞ্জলি ভ'রে এনে...তাঁর পাদুখানির উপর ফুলগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তাঁর মুখের রঙে চাঁপার রঙে যেন মিশে গেল। শাদা বেনারসী জোড় পরিয়ে ভালো ক'রে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। 'কোঁচানো ধুতিটি, গরদের পাঞ্জাবী, পাটকরা চাদরটি গলার নীচ থেকে পা পর্য্যন্ত ঝোলানো—কপালে শ্বেত-চন্দনের তিলক, গলায় ফুলের মালা, ছ'পাশে শাদা ফুলের রাশি—বুকের উপর হাতের মাঝে একটি পদ্মের কুঁড়ি। দেখে মনে হ'তে লাগলো রাজবেশে রাজকীয় ভাবে রাজা ঘুমোচ্ছেন। সে কী শোভা—'। তারপর এই রাজবেশেই শোক-যাত্রা সুরু হ'ল। 'জনস্রোতের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকো' ভেসে চললো, যেন কবি-সম্রাট রাজকীয় বেশে বিশ্রাম ক'রছেন। মনে হ'ল তখন—

এই মত চলে চিরকাল গো,
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।...
আছে ত' যেমন যা' ছিল
হারায়নি কিছু, ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।...

আছে সেই আলো, আছে সেই গান
আছে সেই ভালবাসা
এইমত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া শুধু আসা।

তারপর? তারপর অজস্র পুষ্পমাল্য আর চোখের জলের মধ্য দিয়ে গঙ্গার তীরে।—তোমরা কেউ দেখছ কি সে দৃশ্য? গঙ্গার ও-পারে দিনের রবি অস্ত গেল, আর এ-পারে বাংলার গৌরব-রবি ডুবলো। রবীন্দ্র-বিহীন পৃথিবী হোল অন্ধকার। ২৫শে বৈশাখ বাঙ্গালীর যেমন চির-আনন্দের, ২২শে শ্রাবণ তেমনি চির-দুঃখের হ'য়ে রইলো।

তাঁর বিদায়ের কথা যখন প্রচার হ'ল, পৃথিবীব্যাপী উঠলো হাহাকার। ভারতের এক দিক থেকে অপর দিক, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুঃখের ঢেউ ব'য়ে গেল। যারা-সব লড়াই-যুদ্ধ ছাড়া অন্য কথাই জানে না, তারাও রবীন্দ্র-বিদায়ের সংবাদে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। ভারতের তো কথাই নেই, পৃথিবীর নানা দেশে থেকে জ্ঞানী গুণী মনীষীরা তাঁর উদ্দেশে নানাভাবে শ্রদ্ধা জানালেন। কেউ ব'ললেন তিনি মহা কবি, কেউ ব'ললেন তিনি বিরাট প্রতিভা, কেউ ব'ললেন তিনি মহামানব, কেউ ব'ললেন তিনি শান্তি ও মৈত্রীর অগ্রদূত, কেউ ব'ললেন তিনি সুন্দরের পূজারী, কেউ বা ব'ললেন তিনি পথপ্রদর্শক ঋষি। এর সব কথাই পরম সত্য। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যত কিছুই বলা হোক্ না কেন, তা পর্য্যাপ্ত নয়। তিনি

এত বড় যে তার পরিমাপ হয় না। হাজার হাজার বৎসরের ভিতর তাঁর মতো মহাজ্ঞানী ঋষি পৃথিবীতে আসেন নি। জাতির বহুভাগ্যে এমন এক জনকে পাওয়া যায়। তাঁকে ঋষি বলি কেন? জীবনের পথে যেমন যেমন তিনি অগ্রবর্ত্তী হ'য়েছেন, বিশ্বের অপূর্ব্ব রহস্য তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে তাঁর জীবনের প্রতিস্তরে অতি বিচিত্র ভাবে, আর সেই রহস্য তিনি বিশ্বজনের কাছে প্রকাশ ক'রেছেন ভাব ও ভাষার মধ্যে দিয়ে এমন সুন্দরভাবে ও স্পষ্ট ক'রে, যা একজন মানুষের জীবনে আজও সম্ভবপর হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সব চেয়ে বড় এই কারণেই।

তিনি এত বড় ব'লেই এত কাছে এসে আমাদের ধরা দিতে পেরেছেন। তিনি আমাদের হাসি-কান্না, হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-বেদনায় প্রতিনিয়ত ছায়া পাত ক'রেছেন। আমাদের দুঃখ বেদনার অংশভাগী হ'য়েছেন।—

আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে,
দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।

তিনি আমাদের ছিলেন এমনি একান্তভাবে আপনার। মানুষের দেহ চিরদিন থাকে না, তাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে নেই। তবে সত্যই কি তিনি নেই? কে বলেছে তিনি নেই! তিনি তাঁর ভাবরাশির মধ্য দিয়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে র'য়েছেন আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ ও চিন্তায়। তিনি যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মধ্যে

থাকবেন না, তা জেনে নিজেই তিনি আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন, অতি মধুর ভাবে—

কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।

তিনি কি কোথাও যেতে পারেন? তিনি অমর হ'য়ে র'য়েছেন তাঁর বাণীতে। জগৎ যদি লোপ পেয়ে যায়, তাঁর বাণী থাকবে মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে।

বড় আরো কত এসেছেন গিয়েছেন—ছোটদের কাছে ছোট হ'য়ে ধরা দিয়েছেন কি কেউ? কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে যাই। তিনি তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত ক'রেছেন বিপুল ভাবে, অথচ তোমাদের মতো ছোটদের কাছেও ধরা দিয়েছেন ছোট হ'য়ে।

…আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।…

এই কথাগুলি তাঁর নিজেরই মনের কথা। তিনি শিশুর কাছে শিশুর মতো হ'য়ে ধরা দিতেন। তাঁর শিশু মনোভাবের কিছু কিছু কথা আগেই তোমরা শুনেছ। শিশু ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ ও কল্যাণের চিন্তা তাঁর হৃদয় মন ছেয়ে

রেখেছিল। তাঁর সব কথা কে বলে শেষ করতে পারে? মহাসাগরের মতো তা অগাধ। তাঁর কথা এতক্ষণ তোমরা শুনলে, কিন্তু এত ব'লেও তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ২৫শে বৈশাখ তারিখে। এই ২৫শে বৈশাখ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একটি সুন্দর স্মরণীয় দিন। রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁর জন্মতিথি পালন করা হ'ত উৎসবের ও আনন্দের ভিতর দিয়ে প্রতি বৎসর। এখন তিনি আমাদের মধ্যে নেই—না থাকলেও তাঁর জন্মদিবস তেমনিভাবে পালিত হ'চ্ছে প্রতিবৎসর পরম শ্রদ্ধাভরে দেশের সর্ব্বত্র। যতই দিন যাবে, এই উৎসবের আয়োজন বাড়বে বই কমবে না। তিনি যে অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন, আমরা যতই পাবো তার সন্ধান, ততই আমরা পূজা করতে শিখবো আমাদের কবিগুরুকে।

তোমরা যারা তাঁকে এ-জীবনে প্রত্যক্ষ ক'রেছ, তাদের তো ভাগ্যের তুলনাই হয় না। যাদের সে ভাগ্য হয়নি, তাদের জন্য তিনি কি ব'লে গেছেন শোন,—

বঙ্গভূমে যে তরুণ যাত্রীদল···
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব-জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
···তুমি কবি,···
জয়মাল্য বিরচিয়া রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি'; অনাগত যুগের সাথেও

ছন্দে ছন্দে নানা সূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে,...
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে ?...

একদিন তিনি থাকবেন না জেনে কি তাঁর ব্যথা, কি তাঁর দরদ তোমাদের জন্য। কি সুন্দর তাঁর এই কথাগুলি! তাঁকে পাওয়ার ইঙ্গিত এতে আছে। তাঁকে এখন পেতে হ'লে, তাঁর কাব্য, কবিতা, গান, সাহিত্য এই সকলের মধ্য দিয়ে তাঁকে পেতে হবে। আর এই হ'ল তাঁকে সত্যিকারের পাওয়া। এ সকলের মর্ম্ম বুঝতে হ'লে চাই সাধনা। তিনি তাঁর চিন্তারাশির ভিতর যে দান রেখে গেছেন, তা পেতে হ'লে চাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

তিনি দিয়েই গেছেন আমাদের জন্য অফুরন্ত ভাবে, ফিরে নেন নি কিছুই। তিনি দুঃখও পেয়ে গেছেন নানাভাবে তাঁর দেশবাসীর জন্য। সমগ্র দেশ তাঁর কাছে অশেষ প্রকারে ঋণী। সে ঋণ শোধ হবে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় ও তাঁর স্মৃতিপূজায়। তাঁর প্রকৃত স্মৃতিপূজা করা হবে তখনই, যখন তাঁর বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা বুঝতে শিখবো ও তাঁর সাধনার নির্দ্দেশ মেনে চলবো।

যে আলোক তিনি দিয়ে গেছেন, সেই আলোকে তাঁকে দেখতে হবে, সেই আলোকে তাঁর বাণী বুঝতে হবে। আর তা হ'লেই জীবন হবে ধন্য আর পাওয়া যাবে এমন এক অজানার সন্ধান, যা পেলে সব কিছুই পাওয়া হয়। 'যাবার দিন'এ তিনি বলেছেন—

যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তা'র নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্রমাঝে, যে শতদল পদ্মরাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দু'টি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

তাঁর বাণী চিরন্তন, যুগে যুগে তা মানুষের অন্তর আলোকিত ক'রবে। ভারতের ব্যাস বাল্মীকি যেমন অমর, ভারতের কালিদাস যেমন অমর, বুদ্ধদেব যেমন চিরন্তন, বাংলার রবীন্দ্রনাথও তেমনি চির-অমর ও চিরন্তন। আগে যা ব'লেছি,

সেই কথা আবার বলি। তিনি মহাকবি, তিনি মহামনীষী, তিনি মহামানব, তিনি সত্যসুন্দরের পূজারী আর সর্বোপরি তিনি পথপ্রদর্শক ঋষি। হে সর্বযুগের সর্বকালের ঋষি, তোমায় নমস্কার। হে চিরসুন্দরের পরম প্রকাশ, তোমায় বারবার নতশিরে নমস্কার।

অন্তরে তুমি দিলে আনন্দ—
নব আনন্দ-ধারা ;
প্রাণে সুগভীর দিলে প্রশান্তি
গ্লানি-সন্তাপ-হারা।
... ...
আত্মারে-তুমি যে দান দিয়েছ
সে দান সবার সেরা,
সে তার অলোক-উদ্ভব-স্মৃতি,
স্বর্গ-আলোকে ঘেরা।

এই লেখকেরই লেখা ঃ—

ছেলেদের বিদ্যাসাগর
পৃথিবীর ও-পিঠ
নীল পাখী
ডনকুস্তি
পুরাতন কথা
খেলাঘর
পূজার মেলা
আলমগীরের পত্রাবলী